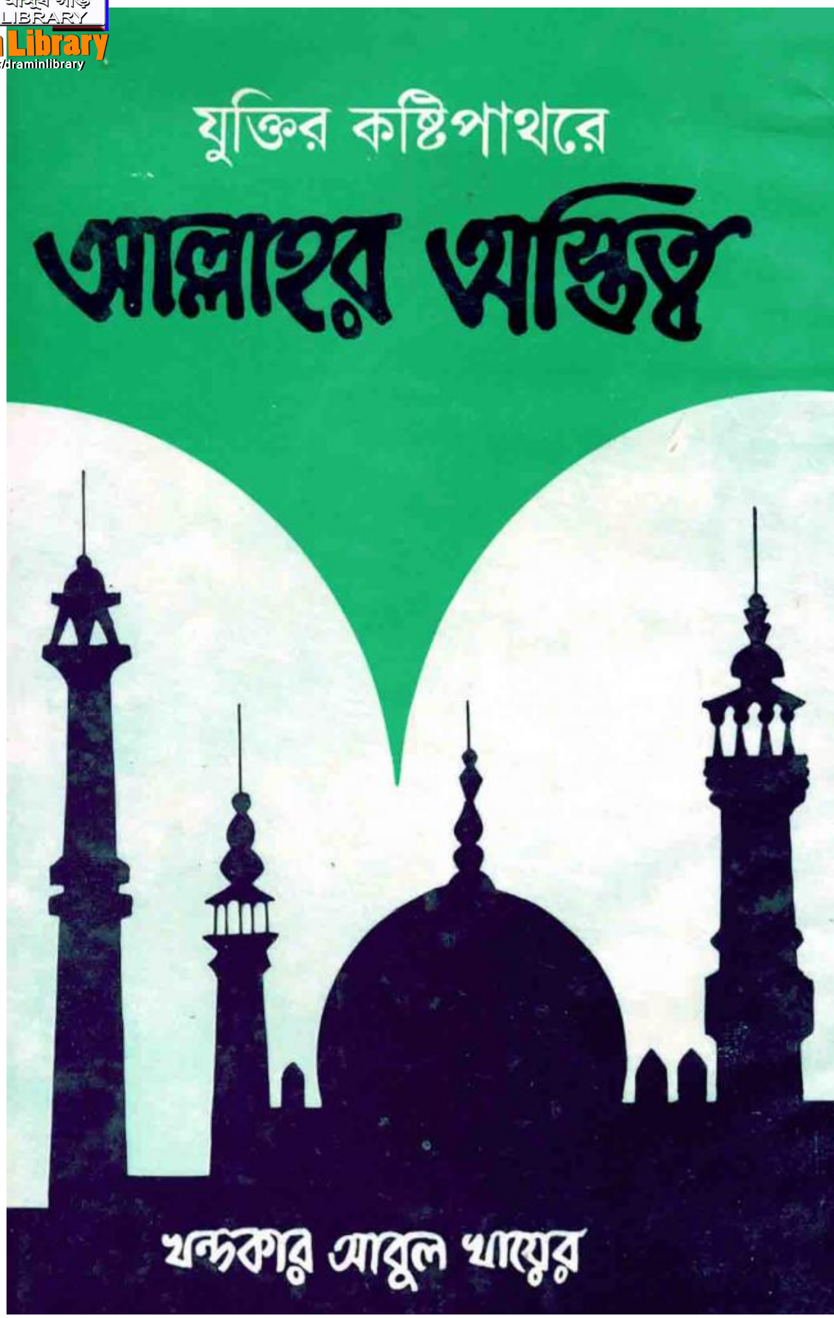
নিজেকে চিনতে বই পড়ি
আলোকিত মানুষ গড়ি
DR.AMIN LIBRARY
Dr. Amin Library
www.facebook/draminlibrary



www.draminlibrary.com

দারসে কুরআন সিরিজ—১৭

যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের

জামেয়া প্রকাশনী
৬, প্যারীদাস রোড, (বাংলাবাজার) ঢাকা—১১০০

www.draminlibrary.com

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ
এ.টি.এম. শফিউদ্দীন
জামেয়া প্রকাশনী
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

৭ম প্রকাশ ঃ
ফাল্গুন ঃ ১৪০৫ বাং
মার্চ ঃ ১৯৯৯ ইং
যিলকাদ ঃ ১৪১৮ হিঃ

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
এ. হাশেম
কনফিডেন্স
৩৮, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বাড কমপ্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০, বাংলাবাজার, [পাঠকবন্ধু মার্কেট], তৃতীয় তলা,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রক ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস
২/১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর
ঢাকা-১১০০

বিনিময় ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র

JUKTIR KASTIPATHARE ALLAHR OSTITTAW (Existence of Allah in the light of argument) written by Khondaker Abul Khair and Published by Jameya Prokashani, Dhaka, Bangladesh. Price Tk. 60.00 Only

ISBN 984 8192 04 2

www.draminlibrary.com

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

www.draminlibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

www.draminlibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

www.draminlibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

www.draminlibrary.com

প্রথম অধ্যায়

যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ – (সূরা হজ্ব, আয়াত ঃ ৪) কিছু মানুষ আছে যারা জ্ঞানের সদ্ব্যবহার ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ "এবং তারা (মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও) ইসলামের শত্রুদেরই অনুসরণ করে চলেছে।" তারা যে চিন্তা বিভ্রাটে ভুগছেন তা দূর করার নিয়তে এ ছোট্ট বইখানা লেখার প্রয়োজন বোধ করেছি। তবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন—

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ * لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ * (الْحِجْرِ – ١٥-١٤)

"এবং তাদের জন্যে যদি আকাশের দরজা খুলেও দেই আর তারা সেখানে আরোহনও করতে পারে অর্থাৎ তারা যদি আকাশে আকাশ যানে চলাফেরাও করতে পারে তবুও তারা বলে উঠবে আমাদের চোখ বিভ্রান্ত হচ্ছে, আমাদের চোখের উপর কেউ যাদু করেছে।" তারা ঈমান আনবে না। তাদের সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তবে তাদের নিকট আমার একটি প্রশ্ন রইল, তা হচ্ছে এই যে, খবর যা রটে তা সত্য অথবা মিথ্যা এর যে কোন একটা হয়ই। কাজেই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে আমরা যে খবর শুনে আসছি তা হয় সত্য অথবা মিথ্যা এর যে কোন একটা হবেই। যদি এ খবর মিথ্যা হয় তবে তো সবাই বেঁচে গেলাম। কিন্তু যদি তা সত্য হয় তবে—

www.draminlibrary.com

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * (الْوَاقِعَةُ - ١-٢)

"যখন সেই মহা ঘটনা ঘটবেই যা আদৌ মিথ্যা নয়।" তখন বিশ্বাসীদের তো বাঁচার একটা পথ হবে। অবিশ্বাসীদের তখন কি উপায় হবে? এ প্রশ্নটার উপর আমি চিন্তা করতে বলব তাদেরকে যারা পরকাল ও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা-বিভ্রাটে ভুগছেন।

শিক্ষিত সমাজের মন-মস্তিষ্ক ঃ

যারা বর্তমান সমাজের মন মস্তিষ্ক সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখেন না তাদের অবগতির জন্যে এখন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি যার থেকে তারা বর্তমান শিক্ষিত সমাজের একটা শ্রেণীর মন মস্তিষ্ক সম্পর্কে অনুমান করতে পারবেন যে এই মুহূর্তে এ বইটা লেখার ও প্রচারের কত প্রয়োজন। যথা—

(১) একদিন এক ভদ্রলোক বলছিলেন, ইউনিভারসিটি পর্যন্ত লেখা-পড়া করলাম এর মধ্যে কোথাও এমন কিছু পেলাম না যার মধ্যে আল্লাহকে বিশ্বাস করার মত কোন যুক্তি আছে। বরং আল্লাহকে অস্বীকার করার মত ভুরি ভুরি যুক্তি পেয়েছি আমরা।

(২) একদিন এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একজন গ্রাজুয়েট কন্ট্রাক্টরের মুখে 'ইন্‌শায়াল্লাহ' শুনে কন্ট্রাক্টরকে লক্ষ্য করে বললেন আপনি এই বিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত লোক হয়ে এখনও আল্লাহকে মানেন।

(৩) বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের ছাপা একখানা বই আমার হাতে পড়ল যার মধ্যে লেখা রয়েছে– "ধর্ম অন্ধযুগের কুসংস্কার... ধর্মের যুগ শেষ হয়ে গেছে এখন বিজ্ঞানের যুগ।... এখন কল্পিত আল্লায় বিশ্বাসের আর কোন প্রয়োজন নেই।" এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের এক শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা। যাদের এরূপ ধ্যান-ধারণা তারা অত্যন্ত সুচতুরতার সঙ্গে তাদের 'আল্লাহ নেই' মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছে, এমন কি এই 'আল্লাহ নেই' মতবাদের ভিত্তিতে এ দেশে রাজনৈতিক দলও গড়ে উঠেছে এবং তারা মুসলমানদের কিছু কিছু ভোটও পাচ্ছে। এ অবস্থায় আল্লাহ-বিশ্বাসীদের বুঝা উচিত যে, ইসলাম ও নাস্তিক্যবাদের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে তখন একই দেশে একই সঙ্গে দুটি মতবাদ চলতে পারে না। চলবে মাত্র একটি।

www.draminlibrary.com

হয় ইসলাম নতুবা নাস্তিক্যবাদ। দুই দলে যখন যুদ্ধ লেগে যায় তখন একদল যদি অস্ত্র ছেড়ে দেয় তবে অপর দলের জয় যেমন সুনিশ্চিত তেমন এই মুহূর্তে যখন লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করা হচ্ছে তখন যদি ইসলামপন্থীরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় তাহলে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা যে চীন-রাশিয়ার ন্যায় হবেনা তার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে কি? এসব বিষয় চিন্তাভাবনা করেই এ বইটা লেখার কাজে হাত দিয়েছি। এখন মুসলমানদের উচিৎ সর্বপ্রকার মতবিরোধ বাদ দিয়ে নাস্তিক্যবাদের খপ্পর থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যে চিন্তাভাবনা করা এবং অকাট্য যুক্তি দ্বারা নাস্তিকতার ভিত্তিহীন যুক্তিগুলি খণ্ডন করে দেয়া। আশা করি দ্বীন দরদী মুসলমানরা আমার এ কথাগুলির উপর চিন্তাভাবনা করবেন।

অতঃপর নাস্তিকদের প্রতি আমার আহবান এই যে, এই ছোট্ট বইয়ে উত্থাপিত যুক্তিগুলি খণ্ডন করার মত কোন যুক্তি আপনাদের কাছে থাকলে তা আমার মত বই আকারে পেশ করে দিন। সমাজ আপনার যুক্তি ও আমার যুক্তি একত্রে পড়বে ও তাদের নিকট যা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হবে তা তারা গ্রহণ করবে। আর সে সাথে আপনারাও এ বইটা পড়ুন যদি আপনার মগজে সত্য ধরা পড়ে তাহলে আপনি নিজেও পরপারের অনন্তকালের জীবনকে হয়তবা বিপদ মুক্ত করতে সক্ষম হবেন। এই আশা নিয়েই আমার এ বইটা আপনাদের কাছে পেশ করলাম।

৩১-৮-৮৮ ইং গ্রন্থকার।

www.draminlibrary.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের বইগুলির পাঠক ও পাঠিকাদের পরামর্শ ক্রমে এ সংস্করণকে দারসে কুরআন সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করা হল। কারণ এর যুক্তিগুলি সবই কুরআন ভিত্তিক। এর সঙ্গে আরও কিছু অতিরিক্ত কথা জুড়ে দেয়া হল। বিশেষ করে অতি সম্প্রতি একখানা বই বের হয়েছে। দেখলাম তাতে ৫৭টা এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যার প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে অস্বীকার করানোর যুক্তি দাঁড় করা। মাওলানা ফারুক নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমাকে জানালেন, সেই বইটা পড়ে. বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নামাযী ছাত্র নাকি নামায ছেড়ে দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে লেখকের চেষ্টা সার্থক হয়েছে। তার প্রশ্নগুলির মধ্যে একটা প্রশ্ন হল ফারায়েজের কিতাবে ওয়ারিসগণের মধ্যে অংশভাগ করে দেয়ার ব্যাপারে এক জায়গায় নাকি আল্লাহ অংকে গরমিল করে ফেলেছেন। নাউযুবিল্লাহ! এই বিষয়কে উল্লেখ করে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে আল্লাহ কি অংক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ? আমি সে বইটার মধ্য থেকে ঐ একটা প্রশ্নেরই মাত্র জওয়াব দেয়ার চেষ্টা করেছি এ সংস্করণে। তাতে দেখানোর চেষ্টা করেছি আল্লাহ কি কি অংক জানেন। অবশ্য আমার ক্ষুদ্র মাথায় কতটুকুই বা আল্লাহর অংক জানার খোঁজ রাখার কথা। তবুও যা যৎকিঞ্চিৎ খোঁজ রাখি তারই কিছু এর মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। যদিও বিষয়টা খুব নিম্নমানের এবং এসব ছোট কথায় কান দেয়া ঠিক নয় তবুও ছাত্রদের বিভ্রান্ত হওয়ার খবর শুনে এতে হাত দিয়েছি।

সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, আপনারা যারা সত্যিকার অর্থে পরকালে বিশ্বাসী তাঁদের হয়ত জানা আছে যে, বর্তমানে দেশে নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং তা বাড়ছে আমাদেরই ছেলে মেয়েদের ভিতর থেকে। আমরা যদিও চোখে দেখছি না বেহেশ্‌ত দোজখ কিন্তু বিশ্বাসের যখন কোন ঘাটতি নেই তখন তারা না বুঝলেও আমরা তো বুঝি যে আমাদেরই প্রাণপ্রিয় ছেলেমেয়েরা সেই জাহান্নামের দিকেই এগোচ্ছে এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জাহান্নামগামী করার চেষ্টা

www.draminlibrary.com

করছে। এসব বুঝার পর আমরা কি করে তাদের অনিবার্য ধ্বংস মেনে নিতে পারি? আমরা তো এমন মনের অধিকারী যে, যে কোন ব্যক্তিকে সামান্য একটু কষ্ট পেতে দেখলেই আমরা তার জন্যে ব্যথিত হয়ে পড়ি। এই মন নিয়েই যখন বুঝি যে কিছু লোক চিরস্থায়ী বসবাসের জন্যে জাহান্নামের দিকে ছুটে যাচ্ছে তখন তাদের জন্যে কি এই মনে ব্যথা লাগার কথা নয়? যদি সত্যই তা লেগে থাকে তবে আমাদের উচিৎ হবে তাদেরকে ফেরানো। এ ফিরানো গায়ের জোরে হবে না। ফিরাতে হবে তাদের জ্ঞানের কাছে যুক্তির মাধ্যমে আপীল করে। এই উদ্দেশ্যেই আমি আমার সাধ্যানুযায়ী এ পুস্তক খানায় চেষ্টা করেছি।

অতঃপর সমস্ত ঈমানদার ভাইদের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন এই যে, বইখানা আপনি ভাল করে পড়ুন। পড়ে যদি বুঝেন যে নাস্তিকতা দূর করতে বই খানা সাহায্য করবে তাহলে পরিকল্পিতভাবে যুবক ছেলেদের পড়তে দিন তাঁদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনায় বসুন। খুব ঠান্ডা মেজাজে অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে লোকদেরকে সত্য বুঝানোর চেষ্টা করুন। কোথাও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, কোথাও বই পড়িয়ে যেখানে যেভাবে যুক্তিসঙ্গত হয় সেখানে সেইভাবে চেষ্টা করে যাওয়া আমি মনে করি ঈমানদার ব্যক্তিদের একটা সব চাইতে বড় নৈতিক দায়িত্ব।

আমার মনের ইচ্ছা যে এ ধরনের বই আরও বাজারে আসুক এবং তা অনুবাদ হয়ে চীন রাশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ুক এবং তামাম বনি আদম আল্লাহর পথে ফিরে আসুক।

আশা করি জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে আমরা আমাদের যার যার নিজের স্বার্থেই আল্লাহকে চিনতে চেষ্টা করব এবং নিজের স্বার্থেই আসুন আর একবার ভেবে দেখবো আল্লাহকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে কি নেই। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

৩১-৮-৮৮ ইং গ্রন্থকার

www.draminlibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ
* وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ
اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ * وَمِنْ
اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا
وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ
وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ق مِّنَ الْاَرْضِ ق اِذَآ اَنْتُمْ
تَخْرُجُوْنَ * وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ *
وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ
الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *
(الروم ٢٠-٢٧)

অনুবাদ ঃ তাঁর নিদর্শনের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষ হয়ে যমীনে ছড়িয়ে পড়তেছ। তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটাও একটা যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতির মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। এবং তিনি

www.draminlibrary.com

তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বিপুল নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা ভাবনা করে। আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ সমূহের ও যমীনের সৃষ্টি (কৌশল)। আর তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য। বস্তুতঃ এর মধ্যেও রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন। আর তার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনের বেলায় নিদ্রা যাওয়া এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা। এর মধ্যেও রয়েছে বহু নিদর্শন তাদের জন্যে যারা (মনযোগ সহকারে) শোনে। আর তার নিদর্শনগুলির মধ্যে এটাও রয়েছে যে তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখান ভয় সহকারে এবং আশা বা লোভ সহকারে। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান। পরে তার সাহায্যে জমীনকে তার মৃত্যুর পর যিন্দা করে তোলেন। অবশ্যই এ সবের মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন তাদের জন্য যারা জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে লাগায়। তাঁর বহু নিদর্শনের মধ্যে এটাও একটি যে আসমান ও যমীন তাঁরই হুকুমে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পরে যখনই তিনি তোমাদের যমীন হতে আহবান করবেন শুধুমাত্র একটি বারের আহবানেই তোমরা সহসা বের হয়ে আসবে। আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর অনুগত ও ফরমাবরদার। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন। আর এটা তার জন্য খুবই সহজ কাজ। আসমান ও যমীনে তার গুণাবলী সর্বোত্তম এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (সূরা রূম, আয়াতঃ ২০-২৭)।

শব্দার্থ ঃ وَ – এবং। مِنْ – হতে। اٰيٰتِ – নিদর্শন। ه – তাঁর (আল্লাহর)। اَنْ – যে। خَلَقَكُمْ – তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। مِنْ – হতে। تُرَابٍ – মাটি। ثُمَّ – পুনরায়। اِذَا – যখন। اَنْتُمْ – তোমরা। بَشَرٌ – মানুষ। تَنْتَشِرُوْنَ – (যমীনে) ছড়িয়ে পড়তেছ। خَلَقَ – সৃষ্টি করেছেন। لَكُمْ – তোমাদের জন্য। مِنْ اَنْفُسِكُمْ – তোমাদের মধ্য হতে। اَزْوَاجًا – স্ত্রীগণ। لِتَسْكُنُوْا – যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পার। اِلَيْهَا – তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে। جَعَلَ – তিনি করেছেন।

www.draminlibrary.com

بَيْنَكُمْ – তোমাদের পরস্পরের মধ্যে। مَوَدَّةً – ভালবাসা। رَحْمَةً – দয়া, অনুকম্পা বা হৃদ্যতা। اِنَّ – নিশ্চয়ই। فِىْ – মধ্যে। ذٰلِكَ – এর। لَاٰيٰتٍ – অবশ্য নিদর্শন রয়েছে। لِقَوْمٍ – (সেই) সম্প্রদায়ের জন্য। يَتَفَكَّرُوْنَ – (যারা) চিন্তা-ভাবনা করে। خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ – আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে। وَاخْتِلَافُ – এবং বিভিন্নতায়। اَلْسِنَتِكُمْ – তোমাদের ভাষার। وَاَلْوَانِكُمْ – এবং তোমাদের (গায়ের) রং এর। لِلْعٰلِمِيْنَ – বিদ্বানদের জন্যে। مَنَامُكُمْ – তোমাদের ঘুম। بِالَّيْلِ – রাত্রের বেলা। وَالنَّهَارِ – এবং দিনের বেলা। يَسْمَعُوْنَ (যারা মনযোগ দিয়ে) শোনে। يُرِيْكُمُ – তিনি দেখান তোমাদের। بَرْقَ – বিজলির চমক। خَوْفًا – ভয়সহকারে। وَ – এবং। طَمْعًا – আশা বা লোভ সহকারে। يُنَزِّلُ – তিনি নাযিল করেন। مِنَ السَّمَاءِ – আকাশ হতে। مَاءً – পানি। فَيُحْيِ – অতঃপর যিন্দা করেন। بِهٖ – এর দ্বারা। الْاَرْضَ – যমীনকে। بَعْدَ – পরে। مَوْتِهَا – এর মৃত্যুর। এখানে মাটির মৃত্যু থেকে মাটির অনুর্বরতা বুঝান হয়েছে। يَعْقِلُوْنَ – যাদের জ্ঞান বুদ্ধি আছে এবং তা কাজে লাগায়। تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ – আসমান ও যমীনের দাঁড়িয়ে থাকা। بِاَمْرِهٖ – তার হুকুমে (বিনা খুঁটিতে)। ثُمَّ – অতঃপর। اِذَا – যখন। دَعَاكُمْ – তিনি তোমাদের ডাক দিবেন। دَعْوَةً – এক মাত্র ডাক। مِنَ الْاَرْضِ – যমীন হতে। تَخْرُجُوْنَ – তোমরা বের হয়ে আসবে। وَلَهٗ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ – আসমান ও যমীনের সব কিছুরই মালিকানা তাঁর। كُلٌّ – সব কিছুই। لَهٗ – তাঁর জন্যে। قٰنِتُوْنَ –

www.draminlibrary.com

অনুগত। اَلَّذِىْ – যিনি। يَبْدَؤُ الْخَلْقَ – সৃষ্টির সব কিছুকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন। ثُمَّ – পুনরায়। يُعِيْدُهٗ – উহা পুনঃসৃষ্টি করবেন। اَهْوَنُ – অতি সহজ। عَلَيْهِ – তাঁর জন্য। عَزِيْزٌ – মহা শক্তিধর। اَلْحَكِيْمُ – মহাজ্ঞানী।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নিজেই তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক যুক্তি হাজির করেছেন। তার মধ্যে সূরা রূমের এ আয়াতগুলির মাধ্যমে পর পর কয়েকটি যুক্তি এখানে হাজির করেছেন— যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হল। এর পর গোটা বইটার মধ্যে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ এরই পরিপূরক আরও কিছু বুদ্ধি ও জ্ঞান গ্রাহ্য যুক্তি। এখানে বলা হয়েছে—

(১) মানুষকে প্রথমে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর মাটির পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ সেই মাটির পৃথিবীর সব কিছুই ভোগ করছে। সেই মাটির সঙ্গেই রয়েছে আমাদের গভীর সম্পর্ক সে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না মৃত্যুর পরও এবং পুনরুত্থানের পরও। এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু শিক্ষা– বলছেন আল্লাহ নিজেই।

(২) আর তিনি সৃষ্টি করেছেন স্ত্রী জাতিকে যাদের সংগে বৈবাহিক সূত্রে তোমাদের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের সূচনা করে এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন মুহাব্বত ও হৃদ্যতা আর তাদের নিকট থেকে পাও পরম প্রশান্তি যার কারণে সংসার জীবনের ভিত্তি হয় মজবুত। এর মধ্যেও রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে বহু শিক্ষ্যণীয় বিষয়।

(৩) এরপর আল্লাহ চিন্তা করতে বলেছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে। যার ব্যাখ্যা অত্র বইয়ের পরবর্তী অংশে দেয়া হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আমাদের ভাষা ও গায়ের বর্ণের বিভিন্নতা সম্পর্কে চিন্তা করতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবার গায়ের রং, মুখের ভাষা একই প্রকার করে দিতে পারতেন কিন্তু তা না করে এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার পিছনে যে আল্লাহর কি হেকমত রয়েছে (যা পরে আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ) তা মানুষ চিন্তা করলে অবশ্যই তার মধ্যে শিক্ষ্যণীয় বিষয় খুঁজে পাবে।

www.draminlibrary.com

(৪) আল্লাহ চিন্তা করতে বলেছেন রাতে ও দিনে মানুষ যে ঘুমায় তা নিয়ে। যাদেরকে আল্লাহ্ জ্ঞান দিয়েছেন, জাগ্রত অবস্থায় তাদের মাথায় কোন না কোন চিন্তাভাবনা থাকেই। এতে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি থাকে সক্রিয়। ফলে তা একভাবে চলতে থাকায় মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি ক্লান্ত ও অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এটাকে পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্যে আল্লাহ্ মানুষের ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্যেও রয়েছে আল্লাহকে চিনবার জন্যে বড় ধরনের নিদর্শন।

(৫) বলা হয়েছে, বিদ্যুতের চমকের মধ্যে রয়েছে ভয় এবং লোভনীয় কিছু। লোভনীয় কিছুরই অর্থ হল লাভজনক কিছু। কিন্তু সেটা কি? এরপর বলা হয়েছে যদ্বারা অনুর্বর জমিকে উর্বর করে গড়ে তুলি। এটা যে কি তা এবার আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। তা হচ্ছে গাছের খোরাক। বিদ্যুতের চমকে মহাশূন্যের নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং এক একবারের চমকে হাজার হাজার টন নাইট্রেট সৃষ্টি হয়ে তা পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এর মাধ্যমেই আল্লাহ অনুর্বর জমিকে উর্বর করে গড়ে তোলেন। কাজেই আমরা দেখি বৃষ্টির পানিতে বিনা সারে ফসল ফলে। আর মাটির নীচের পানির সাথে বহু টাকার সার দেয়া লাগে।

আমাদেরকে আল্লাহ্ আলো, বায়ু ও পানি— যা না হলে জীবন রক্ষা সম্ভব নয়— এগুলোকে যেমন কেনার বস্তু বানাননি ঠিক তেমনই সাধারণ ভাবে ফসল ফলানোর জন্যে আকাশে রক্ষিত হাজার হাজার টন গাছের খোরাকও কেনার মত সম্পদে পরিণত করেননি। যেন আমরা সহজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রুজী পেতে পারি। এর মধ্যেও রয়েছে আল্লাহকে চিনবার মত বহু নিদর্শন।

(৬) আর আসমান ও যমীন মহাশূন্যের মধ্যে বিনা খুঁটিতে শূন্য ভরে রয়েছে। এই বিরাট ওজনের পৃথিবীটাকে শূন্য ভরে কিভাবে আল্লাহ রেখেছেন এই একটা মাত্র বিষয়ের উপর চিন্তা করলে কেউই নাস্তিক থাকতে পারে না। আর তা রয়েছে চালু অবস্থায়। যার সন্ধান আমরা পেয়েছি কুরআন নাযিলের বহু পরে। এরমধ্যেও রয়েছে আল্লাহকে চিনবার মত বহু নিদর্শন। এভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করতে যিনি সক্ষম তিনিই একদিন ডাক দিবেন কবর থেকে বেরিয়ে আসতে। আর প্রত্যেকেই আল্লাহর ডাকে যমীনের ভিতর থেকে জিন্দা হয়ে উঠে পড়বে। একদিন যেমন আমরা মায়ের পেট

www.draminlibrary.com

থেকে বেরিয়ে আসছি ঠিক তেমনই একদিন আমরা বেরিয়ে আসব যমীনের ভিতর থেকে।

এর প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর যে কেউই গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন তারই মাথায় ধরা পড়বে আল্লাহর অস্তিত্বের যুক্তি।

এছাড়া এই সূরা রুমেরই ১ম আয়াতে আল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে রোম আজ হেরে গেল কিন্তু এই রোমই ৯ বছরের মধ্যে পুনরায় আহলে কিতাবদের দখলে আসবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে অনেকের মধ্যে আবু জেহেল বাজি ধরেছিল যে যদি তা হয় তবে আমি ১০০ শত উট দেব। পরে ৯ বছরের মধ্যে যখন রোম পুনরুদ্ধার হল তখন আবু জেহেলের নিকট থেকে ১০০ শত উট আদায় করা হয়েছিল— যা ঐতিহাসিক সত্য— এবং তা বায়তুল মালে জমা দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করে তারা এ বাস্তব ঘটনার কি ব্যাখ্যা দিতে পারবে? আর ৯ম হিজরীর হজ্বের মাঠে সূরা 'নছর' নাযিল হওয়ার পর যখন রাসূল (সঃ) আল্লাহর নিকট থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পেয়ে গেলেন যে তাঁর দুনিয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে কাজেই এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি সেই হজ্বের মাঠের উপস্থিত মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন ঃ সূরা নছর নাযিল হয়েছে তোমরা তা শোন।

.......আমার মৃত্যুর সংবাদ এসে গেছে। আমাকে সামনের হজ্বে আর পাবে না। কাজেই আমার জীবনের শেষ হেদায়াত তোমরা গ্রহণ কর। তিনি উটের পিঠের উপর বসে প্রায় সোয়া লাখ মুসলমানের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন সেই ভাষণই হচ্ছে ঐতিহাসিক 'বিদায় হজ্বের ভাষণ।' আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর না পেলে দুনিয়ার কোন্ মানুষটা বলতে পারে যে আর এক বছর পরে আমাকে পাবে না। আর ইতিহাস থেকে এটা কেউই কি প্রমাণ করতে পারবে যে অমুক সুস্থ ব্যক্তি কোন বক্তৃতায় বলেছিলেন যে এইটাই আমার জীবনের শেষ বক্তৃতা এবং সামনের বছর এই মাস পর্যন্ত আমি বাঁচব না?

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণের কোন ব্যাখ্যা দেয়া যাবে কি? আল্লাহকে স্বীকার করার জন্যে এর যে কোন একটি মাত্র বিষয়ই যথেষ্ট। তবুও লক্ষ্য করুন আল্লাহর আরও কয়েকটি বাণীর প্রতি। পড়ুন নিম্নের আয়াতগুলি। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের আরও ২১ স্থান থেকে

www.draminlibrary.com

কিছু আয়াত অর্থসহ এখানে তুলে ধরা হল। যার প্রত্যেকটিই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ করবে।

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ *

১। যা কিছু আকাশে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে তার প্রত্যেকটির সৃষ্টি কৌশলই আল্লাহর অস্তিত্বের ঘোষণা করছে। যিনি রাজাধিরাজ, মহা পবিত্র, মহা পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী। —জুমুআ ঃ ১

٢- يٰسٓ * وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ * اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ *

২। হে রাসূল! শপথ এই বিজ্ঞানময় কুরআনের (যে কুরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াত সমূহই প্রমাণ করবে যে) নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। —ইয়াসীন ঃ ১-৩

٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط

৩। তুমি কি দেখনা যে আল্লাহ আসমান ও যমীনকে কিভাবে সঠিক ও যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন? —সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ১৯

٤- مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ * (اَلْمُلْكُ- ٣)

৪। তুমি দয়ালু আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি পাবে না। তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এ বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি। দেখ, কোথাও কোন টুটাফাটা বা অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি পাচ্ছ কি? —সূরা আল মুলক্, আয়াত ঃ ৩

٥- اولا يذكر الانسان انا خلقنه من قبل ولم يك شيئا *
(مَرْيَمُ -٦٧)

৫। মানুষের কি এ কথা মনে পড়ে না যে আমি তাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছি যখন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। —মারইয়াম ঃ ৬৭

www.draminlibrary.com

٦- إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ * (البروج - ١٣)

৬। নিশ্চয় তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন। —আল বুরূজ ঃ ১৩

٧- أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ * (الْعَنْكَبُوتَ- ١٩)

৭। তারা কি চিন্তা করে দেখে না যে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন আর কিভাবে তার পুনরাবর্তন ঘটান। আর এটা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সহজ কাজ। —আনকাবুত ঃ ১৯

٨- أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ * (يٰسٓ - ٨١)

৮। যিনি আসমান ও যমীন আপন শক্তি বলে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তা পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? অবশ্যই সক্ষম। তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। —ইয়াসীন ঃ ৮১

٩- أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ * ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُونَ * (الواقعة- ٥٩-٥٨)

৯। তোমরা কি কখনও চিন্তা গবেষণা করে দেখেছ যে তোমরা যে শুক্র নিক্ষেপ কর তার দিকে? তোমরা কি তার থেকে সন্তান সৃষ্টি করতে পার? না আমি তা করে থাকি? —আল-ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৫৮-৫৯

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

١٠- أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ * (الْغَاشِيَةُ - ٢٠-١٧)

১০। আরবের সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন "তোমরা কি দেখ না যে উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং আকাশকে কিভাবে

www.draminlibrary.com

উর্ধ্বে তুলে দেয়া হয়েছে। এবং পাহাড় পর্বতগুলোকে দেখনা কিভাবে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। আর পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করে কি দেখনা যে তা কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।" —আল-গাশিয়াহ ঃ ১৭-২০

(১) উটকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন মরুভূমির মধ্যে যেখানে পানির অভাবে কষ্ট পাবে সেখানে কয়েক দিনের পানি একদিনে পান করে পেটের মধ্যে জমা করে রাখতে পারে।

(২) আকাশকে এত উপরে রেখেছেন যে, যে কুয়েজার নামক তারকা পৃথিবী থেকে ১৮ শত কোটি আলোক বর্ষ দূরে সে তারকাও প্রথম আসমানের নীচে।

(৩) পাহাড় পর্বতগুলিকে এমনভাবে খিল মেরে দিয়েছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের হিমালয় বরাবর বিপরীত দিকে মেক্সিকোতে সে মাথা খাড়া করে উঠে পড়েছে। যেন পৃথিবী দ্রুত গতিতে চলতে গেলে তার কোন স্থানচ্যুতি না ঘটে।

(৪) পৃথিবীকে এমন ভাবে বিছিয়েছেন যে মানুষ যেন তার গায়ের উপর বসবাস করতে পারে। অপর দিকে মধ্যাকর্ষণ দিয়ে সব কিছুকে পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

١١- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * (البقرة- ٢٨)

১১। তোমরা কি করে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার। অথচ তোমরা প্রথম অবস্থায় মায়ের পেটে ছিলে মৃত অবস্থায় তারপর আমি তোমাদের জীবিত করলাম। এরপর সেই আল্লাহই তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং তিনিই তোমাদের পুনরায় জীবিত করবেন। অতঃপর তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।) —আল বাকারাহ ঃ ২৮

١٢- أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ * (الواقعة- ٧٠-٦٨)

www.draminlibrary.com

১২। তোমরা যে পানি পান কর তার দিকে কি কখনও চিন্তা গবেষণা করে দেখেছ? মেঘ থেকে কি তোমরা পানি বর্ষাও না আমি তা বর্ষাই? আমি ইচ্ছা করলে সমুদ্রের নোনা পানির ভিতর থেকে বাষ্পাকারে নোনা পানিই আনতে পারতাম, নোনা পানির মেঘ হতে নোনা পানি বর্ষাতে পারতাম। তোমাদের ক্ষতি হবে তাই তা করি না, তবুও তো তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না? —আল ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ ৬৮-৭০

১৩- اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ج فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ *

(النحل - ٦٠)

১৩। কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষাণ আর তার দ্বারা সুন্দর বাগ বাগিচা রচনা করেন যার গাছ পালা গুলি উদ্ভূত করা তোমাদের জন্য আদৌ সম্ভব ছিল না। আল্লাহর সঙ্গে এইসব কাজে কি অন্য কেউ শরীক ছিল? বরং এসব লোক সত্য পথ থেকে ফিরে যাচ্ছে। —আন্ নামল– ৬০

১٤- اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج

(البقرة- ١٩)

১৪। আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যে রয়েছে অন্ধকারময় মেঘমালা ঝড় তুফান, মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চমক (যার মাধ্যমে আকাশে রক্ষিত নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় যা গাছের খাদ্য। আর তা পানির সঙ্গে মিশিয়ে আল্লাহ যমীনে বর্ষাণ যেন যমীন উর্বর হতে পারে।) —আল-বাকারাহ ঃ১৯

১৫- وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا - (الجاثية-٥)

www.draminlibrary.com

১৫। এবং আল্লাহ আকাশ থেকে (গাছের) আহার সহ যে পানি নাযিল করেন তার কল্যাণে অনুর্বর ভূমি উর্বর হয়ে ওঠে। —জাছিয়াহ ঃ ৫

١٦- اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ * (النمل- ٦١)

১৬। কে তিনি যিনি দ্রুত চলমান পৃথিবীকে অনড় অবস্থায় রেখেছেন আর তার বুক চিরে বিশেষ নিয়মে নদী-নালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে খিল স্বরূপ পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন এবং পানির দুটি ধারার মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর সঙ্গে এইসব কাজে আর কোন খোদা শরীক ছিল কি? বরং অধিকাংশ মানুষ এসব বোঝে না। —আন নমল ঃ ৬১

١٧- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ * (النمل- ٦٣)

১৭। কে তিনি যিনি স্থল পথে ও পানি পথে পথ হারিয়ে গেলে তোমাদের পথ দেখান। আর কে তিনি যিনি বাতাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্প পাঠান এবং সুসংবাদ পাঠান (বৃষ্টি হওয়ার) এসব কাজ করার ব্যাপারে কেউ কি ছিল আল্লাহর সঙ্গে শরীক? তারা শিরক করে যার সাথে আল্লাহ তার থেকে ঊর্ধে। —আন্ নমল ঃ ৬৩

١٨- وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ * (النحل -١٦)

১৮। এবং তিনি তাদেরকে তারকার সাহায্যে পথ দেখান (অর্থাৎ তারকার অংক করে বুঝতে পারবে যে সে কত ডিগ্রি অক্ষাংশে ও কত ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে আছে। আর তা জানতে পারলেই বুঝা যাবে কোন দিকে কত ডিগ্রি কোণ করে কত মাইল পথ অতিক্রম করলে আপন গন্তব্য স্থানে পৌছা যাবে।) —আন-নহল ঃ ১৬

www.draminlibrary.com

١٩- قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ * (النمل-٦٤)

১৯। (হে রাসূল আপনি সেই অবিশ্বাসীদের) বলুন যে উপরোক্ত কাজগুলি করার ব্যাপারে যদি আর কেউ আল্লাহর সাথে শরীক থেকে থাকে তাহলে তার দলীল প্রমাণ হাজির কর যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়।

—আন্ নমল ঃ ৬৪

٢٠- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ - (الواقعة - ٥٧)

২০। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম, আর এর সত্যতা তোমরা স্বীকার করবে না কেন? —আল-ওয়াকিয়াহ ঃ ৫৭

٢١- فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ * وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ * (الوقعة - ٨٤-٨٣)

২১। যদি তোমরা আল্লাহর আওতার বাইরে হয়ে থাক তাহলে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ যখন তার গলদেশ পর্যন্ত এসে যায় আর যখন তা স্বচক্ষে দেখ তখন তার প্রাণটা ফেরত নিয়ে আসতে পার না কেন? অর্থাৎ মাত্র একটা মানুষেরই মৃত্যুটা একবার ঠেকাও না দেখি কেমন পার?

—আল ওয়াকিয়াহ ঃ ৮৩-৮৪

শুধু ইহাই নয়, বরং গোটা কুরআনই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ।

উপরোক্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যাই হচ্ছে এ ছোট্ট বইখানা। এ আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে ৫টি জিনিসের প্রমাণ করবো। যথা ঃ-

(১) আল্লাহর অস্তিত্ব।

(২) কুরআন আল্লাহর বাণী।

(৩) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।

(৪) পরকাল হবেই যেখানে বিচার হবে এবং বিচারের ফলভোগ করা লাগবেই। এবং

(৫) ইসলামই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য সঠিক ধর্ম।

www.draminlibrary.com

নাস্তিক্যবাদের উৎস

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাণীর আদি উৎপত্তি সম্পর্কে ডারউইন এক থিওরী পেশ করলেন যার নাম হলো 'ক্রম বিবর্তনবাদ'।

এ থিওরীতে বলা হলো ঃ এককোষা প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশবাদের ধারা মুতাবিক ব্যাঙ, বানর ও বন-মানুষের পর্যায় পার হয়ে আমরা মানুষ হয়ে পড়েছি। এ মতবাদে আদম (আঃ) কে প্রথম মানুষ বলে স্বীকার করা হয় না এবং সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকেও স্বীকার করা হয় না। এ মতবাদে জীবনের ব্যাখ্যায় বলা হয় কতিপয় বস্তুগত শক্তির কারণে জীবন আপনা থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি পর্যায়ঃ যথা—

১. Reproduction—প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন জীবন সৃষ্টি হওয়া।

২. Varlation—উৎপন্ন বস্তুতে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া।

৩. Differential Survival—বংশ পরম্পরায় উন্নতি লাভ করে এই পার্থক্যের সম্পূর্ণতা অর্জন করা।

এই থিওরী মুতাবিক আমরা নাকি এককোষা প্রাণী থেকে মানুষ হয়ে পড়েছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইটাই কি মানব জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা? পক্ষান্তরে মানব-জীবন সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ—

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا *

(بنی اسرائیل - ۸۵)

"তুমি বল যে জীবন আল্লাহর হুকুমে সৃষ্ট একটা শক্তিমাত্র। এ সম্পর্কে বুঝার মত জ্ঞান তোমাদের খুব সামান্যই দান করা হয়েছে।"

—বনি ইসরাইল ঃ ৮৫

আল্লাহর ভাষায় এ জীবনের মধ্যে রয়েছে اَلسَّمْعُ শ্রবণ শক্তি। اَلْبَصَرُ দৃষ্টিশক্তি, اَلْفُوَادُ বিচারবোধ সম্পন্ন মন, اَلنَّوْمُ ঘুম, اَلرُّوىٰ স্বপ্ন, اَلْبَيَانُ বর্ণনা-শক্তি ইত্যাদি। কিন্তু নাস্তিকরা এসব তত্ত্ব ও তথ্য বেমালুম উপেক্ষা করে বলে উঠলো। (১) ধর্ম অন্ধযুগের কুসংস্কার (২) মানুষ যন্ত্রবৎ

www.draminlibrary.com

(৩) মানুষ আদম থেকে নয়, বরং আদমের ২ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ। এ ধরনের অনেক কথাই তারা বললো। ডারউইনের ধারণায় সৃষ্ট ক্রমবিকাশবাদের থিওরীকে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে মেনে নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন নব্য বিজ্ঞানী আল্লাহকে অস্বীকার করে বসলো। ঐ সময় জার্মান বিজ্ঞানী কান্ট বললেন, আমাকে বস্তু যোগার করে দাও, বিশ্ব কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি তা দেখিয়ে দেব। হিকেল বললেন, পানি, রাসায়নিক দ্রব্য ও উপযুক্ত সময় পেলে আমি মানুষ তৈরি করে দিতে পারি। ভর্ল্‌টেয়ার বললেন, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেনি বরং মানুষই তাদের কল্পনায় আল্লাহকে সৃষ্টি করে নিয়েছে। নিটশে বললেন, আল্লাহ এখন আর বেঁচে নেই। তাদের ধারণায় মানুষ 'যন্ত্রবৎ'। তাদের ধারণা, মানুষ যতদিন জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ ছিল ততদিন তারা অসহায় মনকে বুঝ দেয়ার জন্যে অগত্যা এক কল্পিত আল্লাহকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে তাই এখন আর কোন কল্পিত আল্লাহকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। ঐ সময় পর্যন্ত যাদের মগজে চিন্তা বিভ্রাট ঢুকেছিল অর্থাৎ আল্লাহর ভাষায় যারা জ্ঞানের সদ্ব্যবহার ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তারা বিজ্ঞানীদের ঐ মতবাদ মেনে নিলো। আধুনিক যুগে এখান থেকেই প্রথম শুরু হয় আল্লাহকে অস্বীকার করার মত এক দুষ্ট মানসিকতা। এ মানসিকতা যাদের পেয়ে বসলো তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ মতবাদ ছাত্রদের মগজে ঢুকানোর চেষ্টায় লিপ্ত হলো। এ চেষ্টা চলে আমাদের দেশেও। ফলে আমাদের ছেলেরা আস্তিক অবস্থায় শিক্ষাগারে প্রবেশ করে, পরে অনেকেই নাস্তিক হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসল।

নাস্তিকদের যুক্তি

আল্লাহকে অস্বীকার করার জন্যে নাস্তিকদের যুক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান তা নিম্নে দেয়া হল। যথা ঃ–

(১) আল্লাহকে দেখা যায় না।

(২) পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা তা অনুভব করা যায় না।

(৩) যারাই সৃষ্টিকর্তা মানে তারাই সৃষ্টিকর্তার দেয়া ধর্ম মানে। তাদের দাবি হচ্ছে এই যে, ধর্মীয় আইন কানুন ও বিধি বিধান সবই আল্লাহর নিকট

www.draminlibrary.com

থেকে পাওয়া। তাই যদি হয় তবে ধর্মীয় আইন কানুন বা ধর্মের কথা অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। কিন্তু দেখা যায় যেখানেই ধর্মের কথা সেখানেই তা অবৈজ্ঞানিক। এতে প্রমাণ হয় ধর্মই অবৈজ্ঞানিক, এসব ধর্ম মানুষের তৈরি।

(৪) আল্লাহকে মানার কোন প্রয়োজন নেই। যতদিন জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভবপর হয় নাই ততদিন মানুষ অসহায় মনকে বুঝ দেয়ার জন্যে অগত্যা এক কল্পিত খোদাকে মেনে নিয়েছিল। এখন যেহেতু জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে তাই এখন আর কল্পিত খোদাকে মানার কোন প্রয়োজন নেই।

এছাড়াও কিছু ছোট খাট যুক্তি তাদের আছে কিন্তু সেগুলি সবই হচ্ছে ঐ ৪টি প্রধান যুক্তির শাখা প্রশাখা। তাদের যুক্তিগুলির জবাব নিম্নে দেয়া হল ঃ

বিবেকের জবাব

১। যারই অস্তিত্ব আছে তার সবগুলিই কি আমরা চোখে দেখে থাকি? এখন এই জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের চরম উন্নতির যুগে এটা কোন যুক্তিই নয় যে যা বিশ্বাস করি তার সব কিছুই চোখে দেখা লাগবে। প্রকৃতপক্ষে অনেক কিছুই আমরা দেখিনা অথচ তা বিশ্বাস করি। যেমন—

(১) বায়ু দেখিনা গায়ে অনুভব করে তা বিশ্বাস করি।

(২) অক্সিজেন দেখিনা কিন্তু তার গুণাগুণ উপলব্ধি করে তা বিশ্বাস করি। যেমন কোন ঘরের দরোজা জানালা সব কিছু বন্ধ করে দেয়ার পর সেই ঘরের মানুষ যেমন বুঝতে পারে যে কিসের যেন অভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আবার দরোজা বা জানালা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন স্বস্তির ভাব অনুভূত হচ্ছে তা দেখেই বুঝতে পারি বায়ুর মধ্যে একটা অদেখা পদার্থ আছে যা নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা গ্রহণ করি।

(৩) আমরা প্রশ্বাসে যে বায়ুটা ছেড়ে দেই সেটা তো আমাদের নাকের খুবই নিকটে থাকে, কারণ তা তো ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে যার মধ্যে থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। ঐ গ্যাসটা একবার বেরিয়ে এসে পুনরায় নাকে প্রবেশ করে না কেন? এবং কি করে বাইরের তাজা অক্সিজেন সহ বিশুদ্ধ বায়ু নাকে গ্রহণ করি? কোন ব্যবস্থাপনার কারণে? এ বায়ুটা যে দেখা যায় না এরইবা পিছনে কোন কারণ রয়েছে? বায়ু পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে

www.draminlibrary.com

কিরূপে লেগে থাকে। বায়ু গরম হলে তার আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পায় কেন। বায়ু কি করে জলীয় বাষ্প ধারণ করে? কি করে পুনরায় বায়ু তা ছেড়ে দেয়? কি করে তার থেকে মেঘ হয়। কি করে মেঘের পানির কণাগুলি একত্রে মিলে একটা পানির ফোটা তৈরী হয়? কেন ঐ পানিটা উপর দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসে? এসব কিছুর মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা আমরা চোখে দেখিনা কিন্তু তার কাজ দেখে থাকি। যেমন–

(১) মধ্যাকর্ষণ দেখি না কিন্তু যে কোন জিনিসের ভার দেখে বা উপর থেকে কোন কিছুকে নিচে পড়ে যাওয়া দেখে মধ্যাকর্ষণ বিশ্বাস করি।

(২) মেঘ ও শিশির পড়া বা কুয়াশা দেখে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বায়ুর সংকোচন ও সম্প্রসারণ ক্ষমতাকে।

(৩) বেতারে কথা শুনে ও টেলিভিশন দেখে ইথারকে বিশ্বাস করি।

(৪) চোখ দিয়ে না দেখেও কাজ দেখে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিশ্বাস করি।

(৫) চোখের সাহায্যে দেখি, তাই দৃষ্টি শক্তিকে না দেখেই বিশ্বাস করি।

(৬) কান দিয়ে শুনি তাই শ্রবণ শক্তিকে না দেখেই তা বিশ্বাস করি।

এভাবে হাজারও জিনিসের কাজ দেখে তার শক্তিকে বিশ্বাস করি। কাজেই এ সব বিশ্বাস যখন করতে পারি তখন কি শুধু আল্লাহকেই তাঁর কাজ দেখে বিশ্বাস করা যাবে না? তাকে কি দেখাই লাগবে? অথচ তাঁর গোটা সৃষ্টিটাই তাঁর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে।

সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস

আমরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি তারা নবী রাসূল (সঃ) গণের সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস করে থাকি। এ বিশ্বাস কি আমাদের জন্যে অযৌক্তিক? যদি তাই হয়, তবে–

(১) একজন হাকিম কি করে নিজে না দেখে সাক্ষীর কথার উপর আস্থা করে একটা মানুষকে ফাঁসি দিতে পারেন? আর এই সাক্ষীর উপরই বিচার নির্ভরশীল। আর এই সাক্ষ্য ছাড়া বিচার বিভাগই অচল। এখানে কি করে গোটা পৃথিবীর বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে একমাত্র সাক্ষীর উপর নির্ভর করে?

(২) মায়ের সাক্ষ্যতে মানুষ কি করে বাপ কে একথা বিশ্বাস করতে পারে?

www.draminlibrary.com

(৩) অন্যের সাক্ষ্য পেয়ে কি করে মানুষ পৃথিবীর ভৌগলিক বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি চোখে না দেখেও বিশ্বাস করতে পারে?

(৪) কোন মিথ্যাবাদী লোকও যদি পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ ঘুরে এসে এক এক জায়গার এক এক ধরনের প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা দেয় তখন তাঁর কথায় কি করে ঐসব স্থানের না দেখা জিনিসগুলিও আমরা বিশ্বাস করতে পারি?

এসব যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস করতে পারি তাহলে–

(১) নবী রাসূলগণের সাক্ষ্য থেকে আল্লাহকে কি বিশ্বাস করা যাবে না? এখানে নিরপেক্ষ বিবেক কি বলে? বিবেক বিশ্বাসই করতে বলে। এরপরও যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাহলে হয় সে তার বিবেকের সঙ্গে দারুণভাবে দুশমনি করে, অথবা নিরপেক্ষ বিবেক তার মধ্যে অনুপস্থিত ধরে নিতে হবে।

(২) যাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে তারই কি অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি? আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরের জ্ঞানকে কি আমরা অস্বীকার করি? তাই যদি করি তাহলে–

(১) সূর্যকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটা দ্বারা অর্থাৎ চোখ দ্বারা দেখে বিশ্বাস করতে পারি কারণ ইন্দ্রায়ানুভূতির আওতার মধ্যে, কিন্তু সূর্য যে পৃথিবীর চাইতে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় যা আমরা বিশ্বাস করি তা আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি? এর দ্বারা কি প্রমাণ হল না যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও জ্ঞানের একটা পৃথক অবস্থান আছে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বহু জিনিস বিশ্বাস করি।

(২) আমরা যে বিশ্বাস করি চাঁদে বায়ু নেই সেখানে যেতে হলে কৃত্রিম অক্সিজেন নিয়ে যেতে হবে। এটা কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছিল? এখানে কি প্রমাণ হল না যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধি ছাড়াও আরও জ্ঞান আছে যে জ্ঞান নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম। কাজেই কারও দেখা কথার উপর বিশ্বাস না করেই শুধু জ্ঞানের সিদ্ধান্ত মুতাবিকই কৃত্রিম অক্সিজেন পরিমিত পরিমাণই এ্যাপোলো ১১ এর নভোচারীরা নিয়ে গিয়েছিল এবং যারাই মহাশূন্যে পাড়ি জমায় তারা প্রত্যেকেই এভাবে অক্সিজেন সাথে নেয়।

(৩) তাছাড়া এক বিশেষ ধরনের পোশাক দ্বারা শরীরটাকে এমনভাবে জড়িয়ে নিতে হবে যেন বায়ুর আওতার বাইরে গেলে যেখানে বায়ুর সাধারণ

www.draminlibrary.com

চাপ থাকবে না তখন যেন কৃত্রিম চাপে তার দেহটা চাপযুক্ত থাকতে পারে। এরূপ পোশাকের প্রয়োজনীয়তা যে রয়েছে তা কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছিল? ইন্দ্রিয়ের বাইরেও যে মানুষের জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানে ধরা পড়েছিল। কাজেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া আল্লাহকে মানা যাবে না এটা কোন যুক্তিই নয়।

(৩) তাদের ৩য় যুক্তি হচ্ছে বহু ধর্মীয় কথাবার্তা অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। হাঁ তা হতে পারে, তবে সব ধর্মের বেলায় ঠিক নয়। যেমন–

(১) হিন্দু ধর্মে আছে ইন্দ্রদেবতার তৈরি গরুর গাড়িতে করে সূর্যমামা পূর্বগগণ থেকে পশ্চিম গগণে গমন করেন। পশ্চিম সমুদ্রে ডুব দেন সেখান থেকে শুধা পান করেন তারপর তার উল্টো দিক পৃথিবীর দিক দিয়ে আবার ঐ গাড়িতে করে পূর্বগগণে গমন করেন। এটা অবশ্যই যুক্তি বিরোধী কিন্তু শুধু ঐটাই কি সব ধর্মের কথা। ওটা তো বর্বর যুগের কিছু মুনি ঋষি সাধু তাপস— যাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে আদৌ সম্পর্ক ছিল না– তাদের কিছু কথা। কিন্তু ঐটাতো কুরআনের কথা নয়।

ঠিক তদ্রূপ খ্রস্টানদের ধর্ম যাজকগণ এক সময় প্রচার করেছে যে, কেউ এক গালে এক চড় মারলে তাকে আরেকটি গাল এগিয়ে দাও আরেকটি চড় মারার জন্যে। একথায় জালেমদেরকে সমর্থন করা হয় এবং মজলুমদেরকে আরও বেশি অত্যাচারিত হওয়ার নসিহত করা হয়। কাজেই এই ধরনের কথা যদি কোন ধর্মের পক্ষ থেকে বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে সে ধর্ম বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের তৈরি। এ কথার সঙ্গে আমিও এক মত। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এটা কি আল্লাহর কথা, না রাসূলের কথা? এসব তো সুবিধাবাদীদের কথা।

যাদের চোখে শুধু এই ধরনের কিছু ধরা পড়ে তাদের চোখে কি গোটা কুরআনের আর কিছুই ধরা পড়ল না?

প্রকৃতপক্ষে যারা গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে নবী রাসূল (সঃ) গণকে মানতে পারেনি তারা যেসব মনগড়া ধর্ম জনগণকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করে নিয়েছে, তাদের কথা আল্লাহ বলেছেন "তারা জনগণের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে লুটে খায় এবং লোকদেরকে দ্বীনের পথ থেকে ফিরায়।" পীর সুফী দরবেশ সেজে এমন কিছু লোক ইয়াহুদী-নাসারা মুসলমান সব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই রয়েছে। তাদের ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপটাই নাস্তিকদের চোখে ধরা পড়ল অথচ রাসূলের জীবনীর কিছুই তাদের চোখে ধরা পড়ল না।

www.draminlibrary.com

ধর্মীয় কথাগুলো কি যুক্তি বিরোধী না বিজ্ঞান বিরোধী তা পরবর্তী আলোচনা থেকে আসুন বুঝার চেষ্টা করি। তাদের পরবর্তী যুক্তির উপরে ৪১টি যুক্তি এতে দেয়া হল।

অতঃপর যার যার নিজের স্বার্থেই চিন্তা করুন নিম্নের উপস্থাপিত যুক্তিগুলোর উপর। তাহলে আশা করা যায় আপনার মগজেও ধরা পড়বে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ। যা অকাট্য ও মহাসত্য।

আল্লাহর অস্তিত্বের কুরআন ভিত্তিক যুক্তিসমূহ

১নং যুক্তি ঃ

নাস্তিক বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী সৃষ্টি এবং আল্লাহর মতে পৃথিবী সৃষ্টি

বিজ্ঞানীদের ধারণা ঃ কোন এক সময় নাকি সূর্যের পাশ দিয়ে একটা শক্তিশালী নক্ষত্র খুব দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছিল, তার আকর্ষণে সূর্যের দুর্বল অংশ খসে পড়ে। সেই অংশগুলিকে সূর্যের গ্রহ বলা হয়। তারই একটা গ্রহ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। অন্যান্য গ্রহগুলিও পৃথিবীর ন্যায় একদিন সূর্যের মধ্যে ছিল। সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি বলে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে এখনও সেই তাপ রয়েছে যে তাপসহ পৃথিবী সূর্য থেকে খসে পড়েছিল। এই কারণেই পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যার থেকে অগ্নুৎপাত হয়ে থাকে। আর উপরি ভাগ থেকে তাপ কমে গেছে যার কারণে পৃথিবীর উপরি ভাগটা শীতল হয়ে পড়েছে। এরপর বহু আবর্তন-বিবর্তনের পর বর্তমান অবস্থায় এসেছে। এইটাই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা। পৃথিবী সম্পর্কে আল্লাহর কথা হচ্ছে–

إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* (يٰسٓ - ٨٢)

"আল্লাহ যখন যা সৃষ্টি করার এরাদা করেন তখন শুধু বলেন, 'হও' আর তক্ষুণি তা হওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়।" —ইয়াসীন ঃ ৮২

তাই প্রত্যেকটি জিনিস অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি যা কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার জন্যে শুধু হুকুম করেছেন– বলেছেন "হও" আর সঙ্গে সঙ্গে তা হওয়া শুরু হয়ে গেছে।

www.draminlibrary.com

অর্থাৎ তা হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অনেকে فَيَكُوْنُ এর অর্থ করেন যে হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। يَكُوْنُ এর মধ্যে রয়েছে বর্তমান কাল ও ভবিষ্যত কাল। কাজেই يَكُوْنُ এর অর্থ হবে হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল যা পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত হতে থাকবে। এ সম্পর্কে পরে আরও কিছু কথা বলা হয়েছে।

এইবার দেখা যাক, পৃথিবী সম্পর্কে এ দু'টি মতের কোন্‌টি যুক্তিগ্রাহ্য। কতিপয় বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র সূর্যের পাশ দিয়ে একটা শক্তিশালী নক্ষত্রকে দ্রুত বেগে ছুটে যাওয়া। যদি আকস্মিকভাবে একদিন এই ঘটনাটা না ঘটতো অর্থাৎ সূর্যের পাশ দিযে যদি সেই নক্ষত্রটা দ্রুত বেগে ছুটে না যেতো তাহলে পৃথিবী সৃষ্টি হতো না এবং আমরাও সৃষ্টি হতে পারতাম না, এটাই কতিপয় বিজ্ঞানীদের বক্তব্য। এবার দেখা যাক এ বক্তব্য কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য।

আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সূর্যের কিছু দুর্বল অংশ খসে পড়বে এটা কোন অসম্ভব কিছু তা আমি বলতে চাচ্ছি না। তবে বলতে চাচ্ছি এই যে, ৫/৬ শত কোটি বছর পূর্বে মাত্র একদিনই কি এইরূপ একটা ঘটনা ঘটলো? আমরা তো দেখি এক্সিডেন্ট যে সব ব্যাপারে ঘটে থাকে সে সব ব্যাপারে এক্সিডেন্ট একবার ঘটেই শেষ হয় না; বারংবার তা ঘটে। এই যে এক্সিডেন্টটা ঘটলো এটা কি এমন কোন পরিকল্পিত এক্সিডেন্ট ছিল যে একবারই মাত্র ঘটবে, যেন পৃথিবীসহ আরও কিছু গ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়? আর এর পরে শত শত কোটি বছর চলে যাবে আর কোন এক্সিডেন্ট ঘটবে না, এমন কিছু ছিল কি? যদি এ ধরনের কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে তবে সেই পরিকল্পনাকারীকেই সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার না করার আর কোন যুক্তি থাকে না। আর যদি বলা হয় যে এটা কোন পরিকল্পিত এক্সিডেন্ট ছিল না, তাহলে পুনঃ প্রশ্ন জাগবে যে এমন কোন এক্সিডেন্ট কেউ কি কোনদিন হতে দেখেছে বা পৃথিবীর ইতিহাসে এর কি কোন নযির আছে যে কোন ধরনের এক্সিডেন্ট মাত্র একবারই ঘটেছিল, আর ঘটেনি। কিংবা জ্যোতির্বিদদের পরীক্ষায় এটা কি ধরা পড়েছে যে সূর্যের ন্যায় প্রতিটি নক্ষত্রই তো একটা করে সূর্য। তাদের সঙ্গে কি এক্সিডেন্ট ঘটে প্রতিটি নক্ষত্রেরই আমাদের সূর্যের ন্যায় কয়েকটি

www.draminlibrary.com

করে গ্রহ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে এবং সেখানেও কি ক্রম-বিকাশবাদের ধারা মোতাবিক আমাদের ন্যায় মানুষ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীদের চুপ থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু আল্লাহ এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন; তিনি বলেছেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط
يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۷
وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا *

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তো তিনি যিনি ৭ তবক আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুরূপ কিছু পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন সে সব পৃথিবীতে তিনি অহি নাযিল করে থাকেন (একথা তোমাদেরকে এই জন্যে বলা হল) যেন তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান এবং (এ কথাও যেন তোমরা বুঝতে পার যে) অবশ্য আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। —আত্-তালাক ঃ ১২

আল্লাহর একথা থেকে প্রমাণ হয় যে মহা ফাঁকার মধ্যে আল্লাহ হয়ত হাজার হাজার পৃথিবী সৃষ্টি করে রেখেছেন, আর তিনি তা রাখতে সম্পূর্ণ সক্ষম। হয়ত এমন হতে পারে যে প্রত্যেকটি নক্ষত্রই একটা সূর্য এবং তার প্রত্যেকটি নক্ষত্রেরই হয়ত আমাদের সূর্যের ন্যায় কতকগুলি করে গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে। আর তা থাকলে তাদের প্রত্যেকেরই একটা করে আলোর জগৎ হয়ত আছে। এ নিয়ে আমার আসলে কোন প্রশ্ন নেই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এইখানে যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে যদি পৃথিবী সৃষ্টি হত তাহলে পৃথিবী কি মানুষের বা প্রাণীর ব্যবহারযোগ্য হতে পারত? আসুন এবার দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি কেমন হয় তা যাচাই করে দেখি।

এ পৃথিবীতে আমরা দেখি... যা-ই দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয় তাই ব্যবহার যোগ্য হয় না। যেমন– দুটি বাসে সামনা সামনি ধাক্কা লাগলে তার সামনের কাঁচটা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে এমন এক খণ্ড কাঁচ পাওয়া যায় না, যা একটা লুকিং গ্লাস করার মতো গোল হয়ে বা চারকোণা ওয়ালা হয়ে ভেঙ্গেছে। এমন কি চশমার ফ্রেমে ফিট হওয়ার মতও একখন্ড কাঁচ তার মধ্যে পাওয়া যাবে না। অনুরূপ ভাবে ট্রেন এক্সিডেন্ট করে যদি

www.draminlibrary.com

তার লোহার পার্টস পত্র ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরা হয়ে যায় তবে তার মধ্যেও কি মানুষের ব্যবহারযোগ্য এক খণ্ড লোহা পাওয়া যাবে? যেমন একখানা দা খুন্তা কিংবা একটা সুচ অথবা কমপক্ষে জুতায় মারা একটা কুলকাটা কি তার মধ্যে পাওয়া যাবে? তা অবশ্যই পাওয়া যাবে না। তা হলে এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্ট কোন জিনিস ব্যবহার যোগ্য হয় না। আমরা দেখি যা-ই ব্যবহারযোগ্য তা-ই পরিকল্পিত সৃষ্টি। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবী এক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্টি হলে তা নিশ্চয়ই মানুষের ব্যবহার যোগ্য হতে পারত না এবং যেহেতু প্রত্যেকটি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যই পরিকল্পিত সৃষ্টি, আর পৃথিবীও যেহেতু ব্যবহার যোগ্য তাই পৃথিবীও পরিকল্পিত সৃষ্টি। এই পরিকল্পনাটা যার, সৃষ্টিটাও তাঁরই এবং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। তাই আল্লাহ বলেন, "পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন আমার পরিকল্পিত সৃষ্টি।" এসব বিষয় মানুষ চিন্তা ভাবনা করলে মানুষের মন থেকে আপনা হতেই এ কথা বেরিয়ে আসবে যে ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا "হে আমার প্রভু তোমার সৃষ্টির কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করনি। সবই মানুষের উপকারার্থে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করেছ।" —আলে ইমরান ঃ ১৯১

এর পরবর্তী যুক্তিগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করতে পারবো যে এ পৃথিবী কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট নয়, এসবই দয়ালু আল্লাহর পরিকল্পিত সৃষ্টি।

পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ- (حم السجدة- ١١)

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। যা ছিল ধোঁয়া বিশেষ। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাকে (আকাশকে) এবং পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক (ধোঁয়ার ভিতর

www.draminlibrary.com

থেকে) আমার হুকুম অনুযায়ী বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত হও। উত্তরে তারা উভয়ে বললো; আমরা তো পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে প্রস্তুত আছিই।

—হা-মীম আস-সাজ্‌দাহ ঃ ১১

এ আয়াত শরীফ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পূর্বে এমন এক সময় ছিল যেদিন আসমান ও যমীন ছিল না। ছিল মাত্র ধোঁয়ার ন্যায় কোন কিছু। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আসমান ও যমীন; আর তার থেকে সৃষ্টি হলো কোটি কোটি নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ। সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে একই মূলবস্তু থেকে। সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের পরিবারবর্গ (সৌরজগত) সূর্য থেকেই। কিন্তু মানতে হবে যে, এসব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে এক পরিকল্পিত পন্থায়। এ ছাড়াও সুরা ইয়াসীনের মধ্যে যেখানে বলা হয়েছে ; كُنْ فَيَكُونَ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। এখানে فَيَكُونَ এর সঠিক অর্থ এ নয় যে, হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। يَكُونَ শব্দের মধ্যে দুটি কাল, যথা ঃ (১) বর্তমান ও (২) ভবিষ্যৎ; আর এ দুই কাল এক সঙ্গে মিলে হয় আর একটি কাল আর তা হচ্ছে Future Continuous Tense আর তার অর্থটা দাঁড়ায় "হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং হতে থাকে। যেমন, আল্লাহর হুকুম হয় ডিমের মধ্যে একটা 'বাচ্চা পয়দা হও' এই হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমের মধ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা তৈরি হয়ে পড়ে না; বাচ্চা তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। অতঃপর একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেই একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা ডিমের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি আল্লাহ হুকুম করলেন "পৃথিবী তৈরি হও" তখন চোখের পলকের মধ্যে এইরূপ একটি পৃথিবী তৈরি হয়নি– যেখানে মাঝে মাঝে দালান-কোঠাওয়ালা শহর ছিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ছিল, কোটি কোটি মানুষ বসবাস করতেছিল– يَكُونَ এর অর্থ তা নয়। এর অর্থ হলো আল্লাহর كُنْ হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। পরে একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পর একটা পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে পড়ল। এসব কথার সঙ্গে বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনার যদিও মিল আছে তবুও একথা মানতেই হবে যে, এটা আল্লাহর পরিকল্পিত সৃষ্টি। এটা হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হওয়া কোন কিছু নয়। কিংবা এমনও নয় যে, এর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

www.draminlibrary.com

২ নং যুক্তি ঃ

নাস্তিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মানুষ বনাম আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ

কতিপয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মানুষ যন্ত্রবৎ। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ বাকশক্তি ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এবার দেখা যাক উপরোক্ত দু'টি মতের কোনটি ঠিক। আল্লাহ বলেছেন–

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ * (الملك- ٢٣)

বলুন! তিনি (আল্লাহ) তোমাদের দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তা-ভাবনা করার মতো মন দিয়েছেন, (ফলে মানুষের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে) কিন্তু তোমরা খুব কমই আছ যারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর।

—আল-মুল্ক ঃ ২৩

ব্যাখা ঃ একটা মেশিনকে খুলে ফেললে যেমন বহু ছোট ছোট পার্টস-পত্র বেরিয়ে আসে এবং সেগুলিকে পরস্পর সাজিয়ে যেমন একটা চলনসই মেশিন তৈরি করা হয় ঠিক তেমনই অসংখ্য ছোট ছোট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিকে এক সঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাজিয়ে একটা মানুষের দেহ গঠিত হয়। আর সেগুলি (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি) এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, ঠিক যেখানে যা হলে মানানসই হয় সেখানেই তা দিয়ে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ হাতের জায়গায় হাত, পায়ের জায়গায় পা, চোখের জায়গায় চোখ, কানের জায়গায় কান, এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত সুন্দরভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাজানো হয়েছে যার মধ্যে এক চুল পরিমাণ কোন অবিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা নেই। এই কথাটাকেই বুঝান হয়েছে أَنْشَأَكُمْ কথা দ্বারা। যদি মানুষের শুধু অংগগুলিই মেশিনের মত সাজানো গুছানো থাকতো তবে মানুষকে যন্ত্রবৎ বলা যেত। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে আরও কিছু কথা আল্লাহ বলেছেন তা হচ্ছে পরবর্তী কথাগুলি যথা ঃ শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি

www.draminlibrary.com

ও মন। তাছাড়া অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ বলেছেন– عَلَّمَهُ الْبَيَانَ এবং তিনি তাদেরকে (মানুষদের) বর্ণনাশক্তি দিয়েছেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন (النبا-৯) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

"আমি তোমাদের (মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য) ঘুম দিয়েছি।" এ ছাড়াও মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ পাক আরও বহু কিছু বলেছেন। এবার দেখা যাক বিজ্ঞানীদের কথা কতটুকু ধোপে টেকে। আল্লাহ বলেছেন মানুষকে শুধু যন্ত্রই করেননি তাকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন। কোন যন্ত্রই কি তেমনভাবে শুনতে দেখতে পারে? আর পারবে কি মানুষের মত চিন্তা-ভাবনা করতে? এবং পারবে কি কোন যন্ত্র মানুষের মত ঘুমাতে? আর ঘুমিয়ে ২/১টি স্বপ্ন দেখতে এবং ঘুম থেকে জেগে বলতে পারবে কি যে, আমি অমুক অমুক জিনিস স্বপ্নে দেখেছি। আর পারবে কি মানুষের মত খানিকক্ষণ বক্তৃতা করতে এবং কারও সংগে ভালবাসা করতে? কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারবে কি কোন যন্ত্র? এ ছাড়াও মানুষের মধ্যে যেমন স্ত্রী-পুরুষ আছে, যাদের সন্তান হয় এবং ছোট সন্তান ক্রমে ক্রমে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে বর্দ্ধিত হতে থাকে তেমন কোন বৃহৎ মেশিনের পেট থেকে একটা শিশু-মেশিন কি বের হয়ে আসবে এবং তা পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে মানব-সন্তানের ন্যায় বড় হতে পারবে কি? তা যদি পারে তবে সেই দিনই মানুষের সঙ্গে সাধারণ যন্ত্রকে তুলনা করা চলবে; তার পূর্বে নয়। তাছাড়া মানব-দেহের স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যকার যে পার্থক্য এবং সন্তান জন্মলাভের যে আল্লাহর বিধান রয়েছে তার কোন ব্যাখ্যা কি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে দেয়া সম্ভব হবে? তা কস্মিন কালেও সম্ভবপর হবে না।

৩নং যুক্তি ঃ

জন্ম বৃত্তান্ত

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ* ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَٰلِقُونَ*

(الواقعة- ৫৮-৫৯)

তোমরা কি বীর্যকীটের দিকে লক্ষ্য করে দেখেছ যা তোমরা (জরায়ুতে) নিক্ষেপ কর। (যে আমি তা থেকে কি কৌশলে তোমাদের সৃষ্টি করি?)

www.draminlibrary.com

তোমরা কি তা থেকে নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারতে না কি আমি তা করে থাকি? (নিশ্চয়ই আল্লাহই তা করেন)। —আল ওয়াকিয়াহ ঃ ৫৮-৫৯

এ আয়াত শরীফেরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অপর একটি আয়াত শরীফ থেকে। যেমন সূরা মুমিনূনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ* ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ*

(المؤمنون- ١٤-١٢)

"আমি মানুষকে মাটির সারবস্তু হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তা এক টপকানো ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। পরে সেই ফোঁটাকে জমাট বাঁধা এক রক্ত পিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিন্ড বানিয়েছি। তাকেই অস্থিমজ্জা বানিয়েছি, সে অস্থিমজ্জার উপর গোশত পরিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাকে আবার সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। অতএব খুবই বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সমস্ত কারিগর হতে উত্তম কারিগর।"

উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো নিজে নিজেই হয়ে যেতে পারে কি? আর এভাবে কেউ নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে কি? আল্লাহ পাকের এসব কথার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে মানুষের মন আপনা হতেই বলে উঠবে ঃ

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ *

বাস্তবতা বিরোধী যুক্তি

এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অংকের সূত্র ও উত্তর ঠিক হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল হয় না, ঠিক তেমনই অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের থিওরী ঠিক থাকলেও তা বাস্তবতা বিরোধী হয়ে পড়তে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলবো যদি এরূপ একটা অংক কষতে দেয়া যায় যে, বিশজন মিস্ত্রি প্রত্যহ ৫ ঘন্টা কাজ করে, যদি ৩০ দিনে একটা দালান তৈরি করতে

www.draminlibrary.com

পারে তবে ১,৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার) মিস্ত্রি একসঙ্গে কাজ করলে ঐ দালান তৈরি করতে কত সময় লাগবে? তাহলে এর সঠিক ও নির্ভুল উত্তর হবে ১ মিনিট। কিন্তু এক মিনিটে কি একটা দালান তৈরি হয়? এখানে যেমন অংকের উত্তর ঠিক হলেও তা বাস্তবতা-বিরোধী ঠিক তেমনি ডারউইনের থিওরী ঠিক হলেও তা বাস্তবতা-বিরোধী। তা কখনও ঘটবার নয়। অর্থাৎ হিসেবে পাওয়া গেলেও মানুষকে কখনও যন্ত্রবৎ বলা যাবে না, বানরও কোন দিন মানুষ হবে না এবং ডক্টর শহীদুল্লাহর ভাষায় ভবিষ্যতের মানুষও কোনদিন একটা বিরাট মাথায় পরিণত হবে না।

মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে সেই মাকেই যারা অস্বীকার করে তারাও যেমন বাস্তব-বিরোধী ঠিক তেমনই আল্লাহর মেহেরবাণীতে জীবন লাভ করে সেই আল্লাহকেই যারা অস্বীকার করে তারাও তেমনই কাট্টা বাস্তব-বিরোধী। (আল্লাহর ভাষায়) نَسِىَ خَلْقَهٗ তারা ভুলে যায় তাদের জন্মের ব্যাপারটা। এখন কি আর এ সব বাস্তব বিরোধী যুক্তির যুগ আছে?

৪নং যুক্তি ঃ

দিবা-রাত্রি ও চাঁদ সূর্য মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُومُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ *

(النحل- ١٢)

এবং রাত্র-দিন ও সূর্য-চন্দ্রকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁর হুকুমের ফরমাবরদার রয়েছে। এইসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

—আন নাহাল ঃ ১২

আসুন আল্লাহর এই কথার উপর চিন্তা-ভাবনা করে দেখি যে, এর মধ্যে বুঝার কি আছে।

www.draminlibrary.com

আমরা চর্মচোখে দেখি সূর্য ২৪ ঘন্টায়, চাঁদ ২৫ ঘন্টায় ও তারকা ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একবার পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসে অর্থাৎ পৃথিবীকে আবর্তন করে আসে।

আর জ্ঞানীরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখেন পৃথিবী সূর্যের চারপাশ দিয়ে প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় একবার ঘুরে আসে। এর কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা নিয়ে আমার কোন প্রশ্ন নেই। আমার প্রশ্ন মহাশূন্যের মধ্যে যেখানে মানুষের তৈরি স্কাইল্যাব যা কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছিল যার মধ্যে বিজ্ঞানীদের মতে নিখুঁত নির্ভুল হাজারও প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ফিট করা ছিল এবং তা (স্কাইল্যাব) রাখা হয়েছিল পৃথিবী থেকে এক বিজ্ঞানসম্মত দূরত্বে। কিন্তু এত হাজারও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বে তা টিকতে পারলো না, কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে ঢুকে পড়লো।

আর বিজ্ঞানীদের মতে এ পৃথিবীর সৃষ্টি নাকি ৫০০ শত কোটি বছর পূর্বে। ধরে নিলাম তাই ঠিক। তাই যদি হয়, আর এসব যদি অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি হত, তাহলে কি এই ৫০০ কোটি বছর মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহগুলি স্কাইল্যাবের ন্যায় ধ্বংস হয়ে যেত না যদি এ সবের কোন ব্যবস্থাপক না থাকত? আর স্কাইল্যাবের ন্যায় চাঁদটা যদি পৃথিবীর উপর পড়ত, তাহলে পৃথিবীর উপায়টা হত কি?

সূর্যের চারপাশ দিয়ে বছরে একবার করে ঘুরে আসতে পৃথিবীকে যে পথ অতিক্রম করতে হয় তার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৬০ কোটি মাইল। অর্থাৎ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল+ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ= সমান প্রায় ১০ কোটি মাইল ×২ ×২২/৭ =প্রায় ৬০ কোটি মাইল। পৃথিবী এই পথ ঘুরে আসে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায়। এতে পৃথিবীর বার্ষিক গতির গতিবেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল। অর্থাৎ ৬০ কোটি মাইল ÷৩৬৫×২৪ ঘন্টা+৬ ঘন্টা × ৬০ মিনিট × ৬০ সেকেণ্ড= ১৯.০১ মাইল। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবী তার বার্ষিক গতির ফলে প্রতিনিয়ত প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল গতিবেগে ছুটছে। পৃথিবীর এই বার্ষিক গতির কথাই আল্লাহ পাক বলেছেন—

كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى - (لقمن- ٢٩)

www.draminlibrary.com

"মহাশূন্যের সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে।" —লোকমান ঃ ২৯। এই চলার পথে পথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর ২৪ ঘন্টায় একবার করে ঘোরে; যার ফলে— দিবারাত্র হচ্ছে।

এই ঘোরার কথাই আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে–

وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ* (يٰسٓ - ٤٠)

মহাশূন্যের মধ্যে সবকিছুই ঘুরছে।" —ইয়াসীন ঃ ৪০

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেছেন–

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ * يٰسٓ:٤٠

সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না এবং রাতও দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এর অর্থ মহাশূন্যের মধ্যে সব কিছুকেই এমন হিসাব মত রাখা হয়েছে ও তাদের চলার পথ এমন বিজ্ঞোচিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যেন এর মধ্যে কোনই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে না পারে। —ইয়াসীন ঃ ৪০

এই কথাটাই বুঝানোর জন্যে আল্লাহ বলেছেন–

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ * (يٰسٓ - ٣٨)

এই কক্ষপথ ও গতি নির্ধারণ মহাশক্তিধরের বিজ্ঞোচিত নির্দ্ধারিত ব্যবস্থাপনা। —ইয়াসীন ঃ ৩৮

যার কারণে মহাশূন্যের কোন কিছুই স্কাইল্যাবের ন্যায় কক্ষচ্যুত হচ্ছে না ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। আমরা চিন্তা করলে আরও দেখতে পাই যদি মহাশূন্যের সবকিছুর চলার জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষপথ না থাকতো তবে পৃথিবী প্রতি বছর সূর্যের চারি পার্শ্বের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে যদি (প্রতি বছর) এক চুল পরিমাণ করে সূর্যের দিকে এগোতে থাকতো (যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডের পার্শ্বে লাগিয়ে দেয়া পিনটা রেকর্ড ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে এক এক বারের ঘোরায় এক এক চুল পরিমাণ করে রেকর্ডের কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকে), তা হলে বহু পূর্বেই পৃথিবী সূর্যের মধ্যে ঢুকে যেত কিংবা যদি একচুল করে দূরে সরতে থাকতো তবে বহু পূর্বেই পৃথিবী বরফে ঢাকা পড়ে যেত। আর এমনটি যদি হতে থাকতো তবে প্রতি বছর পৃথিবী

www.draminlibrary.com

ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেলে পথ বাড়তো, ফলে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় এক শীত কাল থেকে পরবর্তী শীতকাল আসতো না কিংবা যদি সূর্যের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকতো তবে শুক্রগ্রহের ন্যায় ৩৬৫ দিনের বহু পূর্বেই এক বছর পুরে যেত কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বছর পুরতি সময়ের মধ্যে নির্ধারিত সময় অপেক্ষা এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কোন কমবেশি হচ্ছে না। আর হবেও না কোন দিন। চিন্তা করুন যদি এর পিছনে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা কার্যকর না থাকতো তবে এমন নির্ভুল পন্থায় কি দিনরাত, বছর পুরতি ও ঋতুর পরিবর্তন হতে পারতো? কস্মিন কালেও তা পারতো না।

৫নং যুক্তি ঃ

দিবা রাত্র ও ঋতুর পরিবর্তন

আল্লাহ বলেন–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * (اٰلِ عِمْرَانَ- ١٩٠)

"আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী।" —আল-ইমরান ঃ ১৯০

এ আয়াতে আল্লাহ জ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলছেন তোমরা চিন্তা করলে অবশ্যই বুঝবে যে দিবা রাত্র হওয়ার মধ্যে আল্লাহর কি কৌশল রয়েছে। প্রথমতঃ আমরা দেখি পৃথিবীকে সূর্যের চারিপার্শ্বের প্রায় ৬২ কোটি মাইল বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করার জন্য পৃথিবীর গতি করে দিয়েছেন প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল (প্রায় বলা হল এই জন্যে যে এই ২০ মাইল সংখ্যাটা হচ্ছে কাছাকাছি সংখ্যা। নির্ভুল সংখ্যা ২০ মাইল থেকে কিছু সামান্য কম।)

এতে পৃথিবীর চলার গতি কাছাকাছি সংখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপঃ (অবশ্য এ সংখ্যা পাওয়ার উপায় কি তা ইতিপূর্বে ৪নং যুক্তির মধ্যে দেখান হয়েছে।)

www.draminlibrary.com

প্রতি ১ সেকেণ্ডে চলে ২০ মাইল

প্রতি ১ মিনিটে " ২০ × ৬০= প্রায় ১,২০০ মাইল

প্রতি ১ ঘন্টায় " ১২০০×৬০= প্রায় ৭২,০০০ মাইল

প্রতি ১ দিনে " ৭২০০০×২৪= প্রায় ১৭,২৮,০০০ মাইল

প্রতি ১ মাসে " ১৭,২৮,০০০×৩০=প্রায় ৫,১৮,৪০,০০০ মাইল

প্রতি ১ বছরে " ৫,১৮,৪০,০০০×১২= প্রায় ৬২ কোটি মাইল

পৃথিবী এভাবে যে চলছে এবং চলা অবস্থায়ই আছে এতে এক সেকেন্ডেরও কমবেশি হচ্ছে না। এর পিছনে কি কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই? কোন পাগলেও কি বলবে যে তা নেই?

এছাড়াও লক্ষ্যণীয় যে কোন জিনিসকে যদি কোন নির্দিষ্ট দিকে চলার জন্যে গতি সৃষ্টি করে দেয়া যায় তা হ'লে যদি তাকে মধ্যাকর্ষণ ও বায়ু বাধা না দেয় তবে সে একই গতিতে একই দিকে দিক পরিবর্তন না করে চলতে পারে। আমরা দেখে থাকি একটা বলকে যখন লাথি মেরে একটা গতি সৃষ্টি করে উপরে তুলে দেয়া হয় তখন বায়ু তাকে বাধা দেয় বলে তার গতি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। আর মধ্যাকর্ষণ নীচু থেকে আকর্ষণ করে বলে ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। যদি বায়ু বাধা না দিত এবং মধ্যাকর্ষণ নীচুর দিকে না টানতো তাহলে ঐ বল একটা নির্দিষ্ট গতিতে নির্দিষ্ট দিকে দিক পরিবর্তন ছাড়াই চলতে থাকত। ঠিক তদ্রুপ পৃথিবীর গতি না হয় ধরেই নেই যে, কোন এক সময় কোন এক কারণে নির্দিষ্ট গতিতে গতিশীল হয়েই পড়েছে কিন্তু এই গতির বিনা নিয়ন্ত্রণে দিক পরিবর্তন হয় কি করে? যেমন সূর্যের চারিপাশের পথ তো অবশ্যই বৃত্তাকার হতে হবে। নইলে এক স্থান থেকে চলা শুরু করলে সেই স্থানে আর কোন দিনও ফিরে আসতে পারবে না। সে যতই চলবে ততই তার রওয়ানা হওয়ার স্থান থেকে দূরত্ব বাড়বে আর পথ যদি বৃত্তাকার হয় তাহলে অর্ধেক পথ চলার পর রওয়ানা হওয়ার স্থান ক্রমেই নিকটবর্তী হবে এবং পুরা পথ চলার পর সে তার পূর্বের স্থানে ফিরে আসবে। কিন্তু কোন গতিশীল জিনিস বিনা নিয়ন্ত্রণে কি গোলাকার পথ ধরে চলতে পারে? হ্যাঁ তবে কেউ হয়ত বলতে পারেন যে সূর্যের আকর্ষণে তার চারিপাশ দিয়ে পৃথিবী ঘুরছে এবং এটা সম্ভব। কিন্তু এখানেও আমার প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন, সূর্যের আকর্ষণেই পৃথিবী তার চারিপাশ দিয়ে যদি ঘোরে তাহলে

www.draminlibrary.com

ঘুরতে পারে কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কখনও কম হয় কখনও বেশি হয় এটা কি করে হয়? যেমন পৌষ মাসের তুলনায় আষাঢ় মাসে পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ মাইল বেশি হয়। আর যখন পৌষ মাস থেকে দূরত্ব বেশি হওয়া শুরু হল সেটা আবার হঠাৎ করে কমা আরম্ভ হয় কি করে? আর কমতে কমতে পৌষ মাস আসলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমার পর আবার এ দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণটা কি করে ঘটে? এভাবে যদি নির্দিষ্ট কক্ষ পথ থেকে প্রতি বছর এক চুল পরিমাণ করে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকত তাহলে যতদিন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ততদিনে তো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব এত বেশি বাড়ত যে সূর্যকে এতদিনে একটা নক্ষত্রের ন্যায় দেখা যেত কিংবা যদি প্রতি বৎসর একচুল পরিমাণ করে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কমতে থাকত তাহলে পৃথিবী কবে সূর্যের ভিতরে ঢুকে পড়ত। কিন্তু এমন কেন হয়নি? আর এই যে আবহমান কাল থেকে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যে মাসে যে পরিমাণ কম বেশী হয় তা সহকারেই দূরত্ব একই প্রকার রয়েছে এবং দিনরাত ছোট বড় হলেও ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই এবং নেই বছর পুরতিতে কোন কম বেশি। এরপর পুনঃ প্রশ্ন, পৃথিবীর এক মেরু সূর্যের দিকে কিছুটা হেলে চলতে চলতে আবার কি করে হঠাৎ অন্য দিকে হেলা শুরু করে দেয় যেমন জুন মাসে পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্যের দিকে বেশ খানিকটা হেলে রইল, তাই জুন মাসে উত্তর মেরু সূর্যের আলো পেল। পেল তো এমন পাওয়াই পেল যে, সূর্য আর ডুবলই না। এভাবে জুন মাসের আগে ও পরে মিলিয়ে একটানা সূর্যের কিরণ পেল ৬ মাস। আর এ সময় দক্ষিণ মেরু রইল সূর্যের কিরণ ছাড়া অবস্থায়, যদিও পুরা অন্ধকারে রইল না। আবার হঠাৎ কি করে দক্ষিণ মেরুর দিকটা সূর্যের দিকে হেলা শুরু হয়ে গেল। যে কারণে সেপ্টেম্বর থেকে দক্ষিণ মেরুতে সূর্য ওঠা শুরু হয়ে যায়। আর ডিসেম্বরে ভরা দুপুরের ন্যায় দক্ষিণ মেরুতে সূর্য একটানা কিরণ দিতে থাকে আর এই সময় উত্তর মেরু হারিয়ে ফেলে সূর্যকে। এই যে নিয়মিত সময়ের কোন হের ফের ছাড়াই একবার সূর্য বিষুব রেখার উত্তরে আর একবার সূর্য বিষুব রেখার দক্ষিণে, যার কারণে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন মৌসুমী ফল ফলাদি আমরা পাচ্ছি, এটা কি কোন ব্যবস্থাপক ছাড়াই সম্ভব? কোন বদ্ধ পাগলও বলবে না যে, এটা সম্ভব।

www.draminlibrary.com

এই সবকিছু চিন্তা ভাবনা করলে জ্ঞানী লোকদের মাথায় অবশ্যই ধরা পড়বে যে কত সুনিপুণ তাঁর সৃষ্টি কৌশল। এ কারণেই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে আকাশও যমীনের সৃষ্টি কৌশল ও দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শণ।

সূরা ওয়াকেয়ার মধ্যে আল্লাহ এক জায়গায় বলেছেন–

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ *

পূর্বের কথার জবাবে বলা হচ্ছে "তোমরা যা বলছ তা ঠিক নয় বরং আমি তারকার অবস্থিতি স্থানের কসম করে বলছি (যদি তামরা এসব বিষয়ের ওপর চিন্তা ভাবনা কর তাহলে) অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের কিছু তোমরা অনুমান করতে পারবে। অর্থাৎ চিন্তা করতে বলছেন এক তারকা থেকে অন্য তারকার দূরত্ব কত বেশি এবং তা কত বিজ্ঞানসম্মত দূরত্ব।

দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব

সূরা আর রাহমানে আল্লাহ বলেছেন–

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ*

তিনি দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী মাশরিক ও মাগরিব থেকে দুটো করে অর্থ হয়, যথা— মাশরিক অর্থ সূর্য ওঠার স্থান ও সূর্য ওঠার সময় এবং মাগরিব অর্থ সূর্য ডোবার স্থান ও সূর্য ডোবার সময়। এ কারণেই মাশরিক থেকে পূর্ব দিক ও একটা নির্দিষ্ট সময় বুঝি ঠিক তেমনই মাগরিব থেকে পশ্চিম দিক ও মাগরিবের সময় বুঝে থাকি। এখানে আরবী ভাষায় দ্বিবচনের শব্দ গঠন পদ্ধতি অনুযায়ী মাশরিকাইন ও মাগরিবাইন বলে দ্বিবচনের অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর অর্থ হবে সূর্য ওঠার দুই নিয়ম এবং সূর্য ডোবার দুই নিয়ম। এই দুই নিয়মের অর্থ হল সূর্য বিষুব রেখার উত্তর থেকে কিছু দিন ওঠে এবং দক্ষিণ থেকে কিছু দিন ওঠে। সম্ভবতঃ এইটাই হচ্ছে সূর্য ওঠার দুই নিয়ম। আর সূর্য ডোবার দুই নিয়মের অর্থ হল বিষুব রেখার উত্তর দিক দিয়ে কিছু দিন ডোবা এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে কিছুদিন ডোবা। এর ফলে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। যার

www.draminlibrary.com

মধ্যে রয়েছে আল্লাহর এক বিশেষ দান। তাই আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন এই ভাষায় যে "ফাবি আইয়ে আলায়ে রব্বিকুমা তুকাযযিবান?" সূর্যকে দুই নিয়মে ওঠানো ও ডোবানোর মধ্যে যে আমার মেহেরবানী রয়েছে তাকি তোমরা মিথ্যা মনে করতে পার?

এখন প্রশ্ন, সূর্যকে দুই নিয়মে ওঠানো ও ডোবানোর মধ্যে কি মেহেরবানী রয়েছে? এর মধ্যে এই মেহেরবানী রয়েছে যে এতে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে আর তাতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন মৌসুমী ফল গোটা পৃথিবীর মানুষ পেতে পারে। এটা কি কোন এক্সিডেন্টের ফল বা আকস্মিক ব্যাপার হতে পারে? কোন বদ্ধ পাগলও তা বলবে না।

এ ঋতু পরিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহর এক বিশেষ ব্যবস্থাপনা। তা হচ্ছে পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলই সূর্যের কিরণ লাভ করতে পারে। আর এর ফলে একই সময় হয় দুই বিপরীত গোলার্ধে বিপরীত ঋতু। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে বাংলাদেশে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধ অস্ট্রেলিয়ায় গরম কাল। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব আল্লাহর সৃষ্টির সর্বত্রই রয়েছে তাঁর মেহেরবানীর ও তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন।

৬ নং যুক্তি ঃ

গ্রহগুলির কক্ষপথের অবস্থা

আকাশের মহা ফাঁকায় অবস্থিত গতিশীল পৃথিবী ও গতিশীল গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا * (الفاطر-٤١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে যার যার কক্ষে এমনভাবে ধরে রাখেন যেন কেউই আপন কক্ষ পথ থেকে সরে নড়ে যেতে না পারে।" (রাসূল (সঃ) তাঁর এক বর্ণনায় أَنْ تَزُوْلَا শব্দের শেষে مِنْ مَكَانِهَا শব্দটা অতিরিক্ত জুড়ে দিয়েছেন যার অর্থ হল নিজ নিজ কক্ষ পথ থেকে।) রেল গাড়ির চলার পথে যেমন পাটি বসান থাকে যে পাটি রেল গাড়ির চলাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ ট্রেন যতই দ্রুত চলুক না কেন ট্রেনের লাইন চাকাকে

www.draminlibrary.com

সর্বদাই এমনভাবে ধরে রাখে যেন ট্রেন রাস্তাচ্যুত না হতে পারে এবং ট্রেনের লাইনটাও এমন মজবুত করে বসান থাকে যেন লাইনটা সরে নড়ে যেতে না পারে। ঠিক তেমনই মহা ফাঁকার মধ্যে শূন্যে বসান আল্লাহর লাইন যা মহা ফাঁকার মধ্যে প্রতিটি নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহের জন্যে আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন– সেই নির্ধারিত পথ থেকে চাঁদ সূর্য পৃথিবী ও মহাকাশের যাবতীয় নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহ দ্রুত গতিতে অনবরত ঘোরার সময় যেন লাইনচ্যুত না হয়ে যায় তাই বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ উপরোক্ত কথা বলেছেন। অর্থাৎ চর্মচক্ষে বায়ু যেমন দেখা যায় না ঠিক তেমনই মহা ফাঁকার মধ্যে আল্লাহর বসান কোটি কোটি রেল লাইনের ন্যায় লাইন বসান রয়েছে যা আমরা চোখে দেখি না। এই কথাই আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ *

'শপথ সেই আকাশের যে আকাশ বহু বহু গ্রহ নক্ষত্রের কক্ষ পথে ভরা।
—সূরা বুরুজ ঃ ১

আমরা যেমন দেখি একটা বাস লাইনকে ক্রস করে একটা রেল লাইন চলে গেছে ঠিক তেমনই মহা ফাঁকার মধ্যে পৃথিবীর কক্ষ পথকে ক্রস করে অন্য গ্রহের কক্ষপথ অতিক্রম করেছে। পৃথিবীর রেলক্রসিং এ যেমন গেটম্যান ট্রেন চলার সময় বাসের পথকে বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনই ব্যবস্থা আল্লাহর মহাশূন্য রাজ্যেও রয়েছে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বছরে ২ বার ৩০ লক্ষ মাইলের কম বেশি হওয়ার কারণে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথকে ক্রস করেছে। কিন্তু আল্লাহ উভয় গ্রহের চলার সময় এমনভাবে ঠিক করে দিয়েছেন যে কোন গেটম্যান ছাড়াই যেন কোন গ্রহের সঙ্গে কোন গ্রহের ও পৃথিবীর সঙ্গে তার নিকটতম গ্রহের সংঘর্ষ না হয়। এই সব কথাই বুঝানো হয়েছে সূরা ইয়াসিনের–

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ *

এই আয়াত শরীফ দ্বারা। —ইয়াসিন ঃ ৩৮

www.draminlibrary.com

৭নং যুক্তি ঃ

রাতদিনের বাড়াকমা

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * (اٰلِ عِمْرَان- ١٩٠)

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।" দেখুন দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে দিনরাত ছোট বড় হওয়ার ব্যবস্থা। আর এরই মাধ্যমে হয় ঋতুর পরিবর্তন– আর ঋতুর পরিবর্তনের কারণেই আমরা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফল-ফলাদি পাই এবং পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষ সূর্য কিরণ পর্যায়ক্রমে সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এরই মাধ্যমে বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পৃথিবীর প্রতি এলাকার লোক তাদের জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো খাদ্য বস্তু পেতে পারে। এসব কি কোন পরিকল্পনা ছাড়া হতে পারে?

৮নং যুক্তিঃ

মধ্যাকর্ষণ

শুধু তাই নয়, পৃথিবীর আরও বহু বিষয়ের উপর আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি–। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا*

"তিনি আল্লাহ যিনি যমীনকে (পৃথিবীকে) বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তোমাদের পদানত করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা পৃথিবীর সকল জায়গার পথ দিয়ে চলাফেরা করতে পার" আল্লাহ যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীকে মানুষের পদানত করেছেন তা হচ্ছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই মধ্যাকর্ষণের কারণে পৃথিবীর যেখানেই আমরা যাই না কেন মাটি সর্বক্ষণই আমাদের পায়ের নীচেই থাকবে। আমরা যে দিককে উপর বলি ঠিক ঐ দিকটাই আমেরিকার নীচু। কিন্তু মধ্যাকর্ষণের কারণে পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থান

www.draminlibrary.com

থেকেই পৃথিবীর দিককেই নীচু মনে হয় ও পৃথিবীর বাহির পাশকেই উপর মনে হয়। এই মধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে আমাদের পদানত করার কারণে আমরা যেমন যমীনের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারি তেমন বৃষ্টির পানিটা মাটিতে এসে পড়তে পারে। গাছ থেকে ফলটা এসে যমীনে পড়ে এমনকি পানির কলসটা কাত করলে পানিটা গ্লাসে এসে পড়ে ও গ্লাসটা মুখে ধরে কাত করলে পানিটা মুখের মধ্যে যায় ঐ একই মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে। এই মধ্যাকর্ষণের কারণেই মানুষগুলি পথ চলতে পারে, মানুষ পৃথিবীর গায়ের উপর অবস্থান করতে পারে, গাড়িগুলি চলতে পারে। ট্রেন তার লাইনের উপর টিকতে পারে, বৃষ্টির পানি নীচে এসে পড়তে পারে। এমন কি মানুষ যে কাপড় পড়ে এ কাপড়টাও শরীরকে ঢেকে রাখত না যদি মধ্যাকর্ষণ না থাকত। কাপড় উল্টে গিয়ে মানুষ বেআবরু হয়ে পড়ত। মধ্যাকর্ষণ না থাকলে পকেটের টাকা পয়সা কাগজ পত্র উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যেত। মধ্যাকর্ষণ না থাকলে কিছুই ভারী থাকত না। একটা বড় বিল্ডিং এক তোলা পরিমাণও ভারী হত না। ফলে চোরে ইচ্ছা করলে যে কোন জিনিসই হোক বিনা বাধায় নিয়ে যেতে পারত, তার মোটেই কষ্ট হত না। ঢাকার বিল্ডিংগুলোকে এক রাতেই সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র একটা বড় শহর গড়ে নেয়া যেত এবং রাতারাতিই ঢাকা শহর ফাঁকা মাঠে পরিণত হয়ে পড়ত। এছাড়া পৃথিবীর কোন শহরই একস্থানে বেশি দিন টিকতে পারত না। শুধু শহর নয় বরং কোন কিছুই কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতে পারত না। মানুষ ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়ে পুনরায় ঘরে ফিরে সে চিনতেই পারত না যে তার ঘর কোনটা এবং তা কোথায় সরে গিয়ে কি অবস্থায় আছে। কোন কিছুকেই কোন নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে রাখা যেত না। শুধু তাই নয় গাছ পালার ন্যায় যারা শিকড় গেড়ে আছে তারা ছাড়া আর সব কিছুই পৃথিবীর গা ছেড়ে উপরে উপঠে পড়ত এবং মহাশূন্যে হারিয়ে যেত, তা আর পাওয়া যেত না। এভাবে পৃথিবীর সবকিছুই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ত। সব চাইতে বড় কথা হল বৃষ্টির পানি কখনই আর যমীনে এসে পড়তে পারত না ফলে যমীনে ফসল আবাদ হতে পারত না এবং কোন প্রাণীরই খাদ্যের কোন ব্যবস্থা হতে পারত না। শুধু তাই নয় মধ্যাকর্ষণ না থাকলে বাতাসটাও পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে পারত না। কারণ বাতাসেরও ওজন আছে আর ওজন থাকার অর্থই হল

www.draminlibrary.com

মধ্যাকর্ষণ তাকে নীচের দিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ পৃথিবী তার গায়ের দিকে আকর্ষণ করে বাতাসকে পৃথিবীর সঙ্গে ধরে রাখার জন্যে। এটা সাধারণের বুঝার সহজ উপায় হচ্ছে এই যে কোন জায়গায় ধোঁয়া দেখলে আমরা দেখতে পাই যে ধোঁয়া উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। এটা কেন হয়? হয় এই জন্যে যে বাতাসের ওজনের চাইতে ধোঁয়ার ওজন কম। এই জন্যেই হালকা ধোঁয়া ভারী বাতাসের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে যায় যেমন পানি এবং কেরোসিন তেল এই দুইটার মধ্যে পানির ওজন কেরোসিন তেলের ওজনের চাইতে বেশি তাই কেরোসিন তেলের মধ্যে পানি দিলে পানিটা নীচে নেমে যায়। আর কেরোসিন তেল উপরে ভেসে উঠে। এটা দেখে যেমন বুঝতে পারি যে, সম আয়তনের পানি অপেক্ষা করোসিন তেল হালকা ঠিক তেমনই ধোঁয়াকে উপরে উঠতে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে সম আয়তনের বায়ু অপেক্ষা ধোঁয়া হালকা। এর থেকে আরও প্রমাণ হল যে বায়ুরও ওজন আছে এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তি বায়ুকে পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে ধরে রেখেছে। কিন্তু যদি মধ্যাকর্ষণ না থাকত তাহলে বায়ু পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে পারত না এবং বায়ুর অবর্তমানে পৃথিবীর একটি প্রাণীও বাঁচতে পারত না এবং যে কারণে মেঘ হয় এবং তা উপরে হয় সে কারণটাও আর থাকত না ফলে মেঘও হতে পারত না। আর মেঘ হলেও বৃষ্টির পানি নীচে এসে পড়তে পরত না এবং কেউ তা টেনে নীচে নামালেও যেখানে পড়ত সেখানেই পড়ে থাকত, তা গড়াতে পারত না। এমনকি মধ্যাকর্ষণ না থাকলে উপর নীচুই থাকত না। আর পা নীচুর দিকে মাথা উপরে থাকার মত কোন অবস্থাই থাকত না। আল্লাহর এমন পরিকল্পিত ব্যবস্থা যে সূর্যের কিরণে মাটি গরম হবে, আর মাটির গরম তাপ মাটির উপরি ভাগকে সব সময় গরম করে রাখবে। আর বায়ুকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, বায়ু যত গরম হবে তত তার আয়তন বাড়বে। আর আয়তন বাড়লেই সে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা লাভ করবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করবে। এরপর আল্লাহর এমনই ব্যবস্থা যে বায়ু যত উপরে উঠবে ততই ঠাণ্ডা হবে আর ঠাণ্ডা হলেই তার আয়তন কম হয়ে যাবে ফলে ঐ বায়ু আর পানিকে ধরে রাখতে পারবেনা; পানির কণাগুলিকে ছেড়ে দেবে। তখন পানির ঐ ঘন কণাগুলিই মেঘে পরিণত হবে। এরপর বায়ু যতই ঠাণ্ডা হবে ততই আরও বেশি

www.draminlibrary.com

সংকুচিত হবে এবং পনির কণাগুলি ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হয়ে অনেকগুলি কণা একত্রে মিশে একটা পানির ফোঁটা তৈরি হবে আর পানির ফোঁটাটাকে মধ্যাকর্ষণ টেনে মাটিতে নামাবে। এভাবেই বৃষ্টিপাত হবে। আল্লাহর এই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা যদি না থাকতে তাহলে কি এভাবে মেঘ হতে পারতো আর মেঘের পানি কি মাটিতে এসে পৌছতে পারত? এই জন্যই তো আল্লাহ বলেছেন–

ءَانتُمْ اَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ*

"তোমরা কি এভাবে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামাও? না কি আমি তা করে থাকি।"
—সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৬৯

এসব দেখেও কি মনে হয় যে, এসব ব্যবস্থাপনা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে?

অতঃপর আল্লাহ বলেন, "এ পৃথিবীর কাজ যখন শেষ করবো—যখন কেয়ামত ঘটাবো তখন বর্তমানকার এ সিস্টেমই পাল্টে দেয়া হবে,"! মধ্যাকর্ষণ ও বায়ু তুলে নেয়া হবে তখন কিছুই আর ভারি থাকবে না। তখন وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا মধ্যাকর্ষণের অনুপস্থিতিতে পাহাড় পর্বতের বন্ধনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে বালুর ন্যায় উড়তে থাকবে। —আন-নাবা ঃ ২০

৯নং যুক্তি ঃ

সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব সম্পর্কে

সূরা আর রাহমানে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ*

"সূর্য ও চন্দ্রকে একটা নির্দিষ্ট হিসাব মত রাখা হয়েছে।" ইতিপূর্বে আমরা সূর্য সম্পর্কে অনেক কিছুই আলোচনা করেছি। এবার চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব সম্পর্কে আল্লাহ কি বলছেন লক্ষ্য করুন। আল্লাহ বলছেন চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে যখন যতটুকু হলে পৃথিবীর মানুষ ও জীব জানোয়ারের পক্ষে সুবিধা হবে আমি ঠিক ততটুকু দূরত্বে রেখে থাকি। দেখুন সূর্যের কিরণ এত বেশি পৃথিবীতে আসে না যাতে জীব জন্তু ও গাছপালাগুলো পুড়ে

www.draminlibrary.com

মরে যায় এবং এত কমও আসে না যে আমাদের ভিজা কাপড়গুলি না শুকায় ও আমরা বরফে ঢাকা পড়ে যাই। বরং আল্লাহ যথাযথই বলেছেনঃ

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط

"দয়ালু আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকার অবিজ্ঞোচিত সৃষ্টি কখনও দেখতে পাবে না।" —আল-মুলকঃ ৩। সত্যই আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকালে হতবাক হয়ে যেতে হয় যে, কি সুকৌশলে এ বিশ্বজাহানকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। দেখুন পৃথিবীর উত্তর অংশে যেহেতু স্থলভাগ বেশি তাই সূর্য যখন বিষুব রেখার উত্তরে জুন মাসের দিকে লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সূর্যের দূরত্ব পৃথিবীর থেকে ডিসেম্বর অপেক্ষা ৩০ লক্ষ মাইল বৃদ্ধি পায়। যেন তাপটা অত্যধিক তীব্র না হতে পারে এবং ডিসেম্বরে যেহেতু বেশির ভাগ পানির উপর সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে তখন উত্তরাংশের মূল ভাগের উপর যেহেতু বাঁকাভাবে বহু পুরা বায়ুস্তর ভেদ করে সূর্যকিরণ আসে তাই সূর্যকে তখন আল্লাহ জুন মাসের তুলনায় ৩০ লক্ষ মাইল নিকটে এনে দেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের এই যে বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা এ কি কোন মহাব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ছাড়াই হতে পারে? তা কস্মিন কালেও হতে পারে না।

চান্দ্রমাসের হাকিকত

এতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের কথা বলা হল; এখন بِحُسْبَانٍ এর মধ্যে চাঁদেরও যে একটা হিসাবের কথা আল্লাহ বলেছেন সেই চাঁদ সম্পর্কেও আসুন কিছু বুঝার চেষ্টা করি। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কমবেশি হয়ে থাকে কিন্তু পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কখনও কম বেশি হয় না। চাঁদকে এমন এক হিসাব মত দূরত্বে রাখা হয়েছে যেন তার থেকে এ পরিমাণ আকর্ষণ পৃথিবী পর্যন্ত আসতে পারে যেন নিয়মিত জোয়ার ভাঁটা হতে পারে। যদি চাঁদ আরও নিকটে হত তাহলে জোয়ারে এত পানি বৃদ্ধি পেত যে পৃথিবীর গায়ের কোন একটি প্রাণীও টিকতে পারতো না। আর যদি আরও দূরে থাকত তাহলে জোয়ার ভাঁটা হতোই না।

এছাড়াও আমরা চাঁদকে দেখি প্রত্যহ কিছুটা দেরীতে ওঠে। এর ফলে চাঁদকে ক্রমে ক্রমে বড় হতে দেখা যায়। আর পূর্ণিমার পরে চাঁদ ক্রমান্বয়ে

www.draminlibrary.com

ছোট হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাবস্যা হয় এবং চাঁদেরএকটা মাস অতিবাহিত হয়।[১] এই মাসগুলি সৌর মাস অপেক্ষা একটু কম হয় ফলে সৌর বছর থেকে চান্দ্র বছর প্রতি বছরে ১১ দিন করে কম হয়। যার ফলে আমরা প্রতি ৩৩ বছর অন্তর একবার বড় দিনে রোযা পাই। যদি চাঁদের বছর সৌর বছরের ন্যায় হত তাহলে যারা বড় দিনে রোযা পেতো তারা সারা জীবনই বড় দিনে রোযা পেতো আর যারা ছোট দিনে রোযা পেতো তারা সারা জীবনই ছোট দিনে রোযা পেতো। এইটা যেন না হয় সেজন্যে এ ব্যবস্থা করেছেন। এটা কি বিনা পরিকল্পনায় হতে পারে?

১০নং যুক্তি ঃ

সমুদ্রের পানিতে লবণের ভান্ডার

লবণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি কিছুটা জ্ঞান আছে। লবণ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। এই লবণের কথা আল্লাহ বলেন–

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا *

যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে (সমুদ্রের ভিতর থেকে নোনা পানি বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে নোনা পানির মেঘ বানাতে পারতাম এবং বৃষ্টির) পানিকে নোনা করে দিতে পারতাম।

এখন চিন্তা করুন কেন আল্লাহ পাক সমুদ্রের পানির মধ্যে লবণকে সংরক্ষণ করলেন। এর বড় কারণ যেটা স্বাভাবিক ভাবেই সবার নজরে ধরা পড়ে তা হল এই লবণ পচন নিবারণ করে। আমরা দেখি ইলিশ মাছে লবণ দিয়ে রাখলে তা আর পঁচেনা। গরুর চামড়াগুলিকেও দেখি লবণ মেখে রাখার কারণে পঁচেনা। এ কারণেই আল্লাহ পাক লবণের ভাণ্ডার করেছেন সমুদ্রের পানিতে। এ জন্যেই সৃষ্টির আদি কাল থেকে এ পর্যন্ত যত মরা পঁচা পানিতে ভেসে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে তা সবই সমুদ্রে সংরক্ষিত লবণে সংশোধিত হয়েছে এবং সমুদ্রের পানিকে সর্বক্ষণই পঁচনমুক্ত অবস্থায় রেখেছে। মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ যদি এভাবে সমুদ্রকে লবণের ভান্ডারে

১. ৭১০ ঘন্টায় চাঁদের একটা দিন রাত। ৩৫৫ ঘন্টায় চাঁদে একটা রাত আর ৩৫৫ ঘন্টায় চাঁদে একটা দিন।

www.draminlibrary.com

পরিণত না করতেন তাহলে সমুদ্রের পঁচা পানিতে একটিও সামুদ্রিক জীব বেঁচে থাকতে পারত না এবং সমুদ্রের পঁচা পানির দুর্গন্ধে এবং বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থল ভাগের কোন জীবনই বাঁচতে পারত না। এসব কিছু দেখেও কি মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারে না। যারা পারে না তাদের চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা চলে।

১১নং যুক্তি ঃ

বাতাসের মধ্যে গাছের খাদ্য

বাতাসের মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের গাছের খোরাক নাইট্রিক এসিড। উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন–

اوكصيب من السماء فيه ظلمت ورعد وبرق ج

"অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তেছে যার মধ্যে রয়েছে অন্ধকারময় (ঝড় ঝটিকা) মেঘের তর্জন গর্জন ও বিদ্যুতের চমক। (আল বাকারা ঃ আয়াত ১৯) আমরা সাধারণতঃ দেখি বৈশাখে বৃষ্টির সঙ্গে উপরোক্ত জিনিসগুলি থাকেই। প্রশ্ন, তা কেন থাকে? এ থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, মাটি যখন শুকিয়ে যায় তখন মাটিতে যেমন পানি থাকে না তেমন গাছের খাদ্যও পরিমিত পরিমাণ থাকে না। ফলে ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজন হয় যেমন পানির তেমন প্রয়োজন হয় সারের। মহান আল্লাহ তাই ঝড় তুফান, মেঘের ডাক ও বিজলীর চমকের মাধ্যমে পানির সঙ্গে গাছের খাদ্য নাইট্রোজেন গ্যাসকে নাইট্রেটে পরিণত করে তা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশিয়ে দেন যার ফলে বৃষ্টির পানিতে জমি উর্বর হয়ে ওঠে। আর এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন–

فاحيابه الارض بعد موتها *

"আর এভাবেই আমি মৃত বা অনুর্বর যমীনকে উর্বর করে গড়ে তুলি।"

এ কারণেই বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে বলেছেন যে যদি কয়েক বছর একাদিক্রমে বিজলীর চমক ও বজ্রপাত বন্ধ থাকে তাহলে পৃথিবীর মাটি আর ফসল উৎপাদনের যোগ্য থাকবে না। তা হয়ে পড়বে ঝামা ইটের ন্যায় যাতে

www.draminlibrary.com

কোন গাছপালাই আর গজাতে পারবেনা। এর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই যে মেঘের তর্জন গর্জন, বজ্রপাত এবং বিজলীর চমক তা এখন এই বিজ্ঞানের যুগে সুস্পষ্ট।

এখন বলুন, এসব কিছুর কোন ব্যাখ্যা কি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে দেয়া সম্ভব? আজ এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগেও যারা এর উপর চিন্তা ভাবনা করে না এবং এত সব অকাট্য যুক্তি চোখের সামনে ভাসমান অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ আল্লাহকে চিনতে অক্ষম হয় তাহলে বলতে হবে সে চরম দুর্ভাগা কিংবা জ্ঞানপাপী। সূরা রূমের ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়ও এ বিষয়ে একবার বলা হয়েছে।

১২ নং যুক্তি ঃ

আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাহিনী

সূরা ইয়াসিনের ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *

তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط (السَّجدة- ٤)

"তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যত কিছু আছে তা সবই ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে আরশের উপর আসীন হয়েছেন।" —আস-সাজদাহ ঃ ৪

যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদেরকে লক্ষ্য করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন—

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ

وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ * وَجَعَلَ فِيْهَا

رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِىْۤ اَرْبَعَةِ

www.draminlibrary.com

أَيَّامٍ ط سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ * ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ * فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ * (حٰمٓ السَّجْدَة- ٩-١٢)

৯। "(হে নবী এদেরকে বলুন) তোমরা কি সেই আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করতেছ— অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ— যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন।.... তিনিই তো সমগ্র জগতবাসীর রব।

১০। আর তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) উপর হতে তার বুকে পাহাড় দৃঢ়মূল করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। আর তাতে সব প্রার্থীর জন্য (অর্থাৎ যে যার সন্ধানী তার জন্য) প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক পরিমাণ মত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন। এসব কাজ মোট ৪ দিনে সম্পন্ন হয়ে গেল।

১১। অতঃপর তিনি আকাশ মণ্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন ওটা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, অস্তিত্ব ধারণ কর, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তখন তারা উভয়ই বললো আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই।

১২। অতঃপর তিনি দুই দিনের মধ্যে সাত আসমান বানিয়ে দিলেন এবং তার প্রত্যেক আসমানে তাঁর বিধি বিধান অহি করা হল। আর দুনিয়ার আসমানকে আমি প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তা পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করলাম। এসব কিছুই এক মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞ সত্ত্বার পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা। —হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৯-১২

শব্দার্থ ঃ قُلْ – বল। أَئِنَّكُمْ – তোমরা কি। لَتَكْفُرُوْنَ – তোমরা কুফরী করতেছ। بِالَّذِيْ – তার সাথে যিনি। خَلَقَ – সৃষ্টি করেছেন। الْأَرْضَ – পৃথিবীকে। فِيْ يَوْمَيْنِ – দুই দিনের মধ্যে। وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ –

www.draminlibrary.com

আর তোমরা বানাও তাঁর সঙ্গে। اَنْدَادًا – প্রতিদ্বন্দ্বী। ذٰلِكَ – এই তো। رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ – বিশ্ব জাহানের প্রভূ। وَجَعَلَ فِيْهَا – এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে। رَوَاسِىَ – পর্ব্বত শ্রেণী। مِنْ فَوْقِهَا – এর উপর থেকে। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপর থেকেই আল্লাহ পাহাড় পর্ব্বত সৃষ্টি করেছেন। وَبٰرَكَ فِيْهَا – এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। وَقَدَّرَفِيْهَا – তাতে সব কিছুর ভাগ বণ্টন ঠিক পরিমাণ মত করে দিয়েছেন। اَقْوَاتَهَا – এর রিযিকসমূহ। فِىْ – মধ্যে। اَرْبَعَةَ – চার। اَيَّامٍ – দিনে। (يَوْمٌ – এর বহুবচন) اَيَّامٌ – বা দিনগুলিতে। سَوَآءً – সমান। لِلسَّائِلِيْنَ – সব প্রার্থীদের জন্য। ثُمَّ – পুনরায়। اِسْتَوٰى – লক্ষ্য আরোপ করলেন। اِلَى – দিকে। السَّمَاءِ – আকাশের। وَهِىَ – এবং তা (ছিল)। دُخَانٌ – ধোঁয়া বিশেষ। فَقَالَ – অতঃপর তিনি বললেন। لَهَا – তাকে (আসমানকে)। وَلِلْاَرْضِ – এবং যমীনকে। اِئْتِيَا – অস্তিত্ব ধারণ কর। طَوْعًا اَوْكَرْهًا – ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। قَالَتَا – তারা বলল অর্থাৎ আকাশ মণ্ডল ও যমীন বলল। اَتَيْنَا – আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম। طَائِعِيْنَ – অনুগতদের মতই। فَقَضٰهُنَّ – অতঃপর এর সবকিছু সম্পন্ন করা হল। سَبْعَ سَمٰوٰتٍ – সাত আসমান। فِىْ يَوْمَيْنِ – দুই দিনের মধ্যে। وَاَوْحٰى – এবং অহি করলেন। فِىْ السَّمَاءِ اَمْرَهَا – আকাশে এর হুকুম। وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا – এবং সুসজ্জিত করলাম পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে। بِمَصَابِيْحَ – জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দ্বারা। وَحِفْظًا – এবং সংরক্ষণ। ذٰلِكَ – উহা تَقْدِيْرُ – নির্ধারিত করা। الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ – মহাশক্তিধর ও মহাজ্ঞানী (কর্তৃক)।

www.draminlibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ উপরের আয়াতে (সূরা ইয়াসিনের ৮২ নং আয়াতে) বলা হয়েছে– আল্লাহ কোন জিনিস সৃষ্টির হুকুম করলে অমনি তা হয়ে যায়।তাই তিনি যেদিন পৃথিবী সৃষ্টি করার এরাদা করলেন তখন বললেন, 'কুন' বা 'হও', আর সঙ্গে সঙ্গে 'ফাইয়াকুন' তা হয়ে গেল। এর অর্থ এই নয় যে, মহা ফাঁকার মধ্যে যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে 'কুন বলার সঙ্গে সঙ্গে গাছ পালা, নদী নালা, পাহাড় পর্বত, জীব-জানোয়ার ঘর বাড়ি ও ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ সহ এই পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়ে পড়ল। দেখুন মুরগীর ডিমের মধ্যে যে বাচ্চাটা পয়দা হয় সেও আল্লাহর হুকুম ছাড়া পয়দা হয় না। তার প্রতিও আল্লাহর 'কুন' শব্দের হুকুমের প্রয়োজন আর আল্লাহ 'কুন' বললেই কি একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা তৈরি হয়ে তক্ষুণি ডিমের খোসা ভেঙ্গে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে? কই তা তো আসে না। তাহলে فَيَكُوْنُ এর অর্থটা কি দাঁড়াবে? আরবীতে একটা কালকে বলা হয় مُضَارِعْ মুজারে যার মধ্যে থাকে দুইটা কাল অর্থাৎ বর্তমান কাল ও ভবিষ্যত কাল। يَكُوْنُ হচ্ছে সেই مُضَارِعْ যার মধ্যে রয়েছে দুইটা কাল যথা বর্তমান কাল ও ভবিষ্যত কাল। তাহলে فَيَكُوْنُ এর অর্থ দাঁড়াল হচ্ছে ও হবে বা হতে থাকবে। আর এই অর্থটা গ্রহণ করলেই সব ধাঁধার অবসান ঘটে যায়। ডিমের মধ্যে মুরগীর বাচ্চা যেমন আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হয়ে বেরিয়ে আসে না ঠিক তেমনই হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বর্তমান যেরূপ আকারে রয়েছে, এইরূপ সৃষ্টি হয়নি। মুরগীর ডিমের মধ্যে যেমন একটা নির্দিষ্ট সময় পার না হলে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা সৃষ্টি হয় না সেখানে যেমন আল্লাহরই তৈরি একটা বিধানের মাধ্যমে বাচ্চাটা পূর্ণতা লাভ করে ঠিক তেমনই পৃথিবীও একটা বিধানের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ এক স্থানে বলেছেন, 'লান তাজিদা লি সুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা।" "আল্লাহর আইন শৃঙ্খলার মধ্যে কোন পরিবর্তন কখনই পাবেনা" তাহলে এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সবকিছু আল্লাহর হুকুমে হয় এটাও যেমন ষোল আনা ঠিক তেমনই আল্লাহর তৈরি বিধানের বাইরে কিছু সৃষ্টি হয় না, এটাও ষোল আনা ঠিক। আল্লাহ যখনই পৃথিবীকে সৃষ্টি করার হুকুম করলেন তখন থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তা সৃষ্টি হয় 'ফী সিত্তাতে আইয়্যামিন' অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে।

www.draminlibrary.com

এখানে ছয় দিন থেকে ২৪ ঘন্টার পর পর ছয় দিনেও বুঝা যেতে পারে কিংবা ছয় যুগও ধরা যেতে পারে। আমরা যখন বলি 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' তখন আইয়াম অর্থ যুগ। কাজেই এখানে যদি আইয়াম থেকে যুগ এবং ইয়াকুনু থেকে হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল ধরি তাহলে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় ধাঁধার অবসান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ধরতে হবে তা-ই।

কুরআন ও বিজ্ঞানে সব ক্ষেত্রে টক্কর নেই

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান যেখানে ভুল করেনি সেখানে কুরআন ও বিজ্ঞানে কোন টক্কর নেই। আর যেখানেই বিজ্ঞান ভুল করেছে সেখানেই কুরআনের সঙ্গে বিজ্ঞানের টক্কর লেগেছে। আমাদের সমাজে (অবশ্য আমার দৃষ্টিতে) ৩ ধরনের পোক্তা ঈমানদার লোক দেখা যায়। যথা–

১। খুব এখলাসের সঙ্গেই এক শ্রেণীর লোক বিজ্ঞানের সাথে বিরোধিতা করেন। তাদের এখলাসের মধ্যে কোন ঘাটতি নেই তবে চিন্তার মধ্যে জ্ঞানের অগোচরেই কিছুটা মোখলেসানা গোঁড়ামী আছে।

২। বিজ্ঞান ভুল বললেও কুরআনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তাদেরও এখলাসের মধ্যে আমার চোখে কোন ঘাটতি দেখি না তবে প্রকারান্তরে তারা যে কুরআনের চাইতে বিজ্ঞানকেই সঠিক ধরে নেন তা তাদের জ্ঞানে ধরা পড়ে না।

৩। বিজ্ঞান যা বলে সেটা কুরআনের দৃষ্টিতে ঠিক হলে তাকে ঠিক বলেই মানে আর কুরআনের দৃষ্টিতে বেঠিক হলে তাকে বেঠিক বলেই মানে। আমি আমার জ্ঞান মুতাবিক এই ৩য় দলে আছি। আমি এই শেষ দলভুক্ত থেকেই চিন্তাভাবনা করে দেখেছি পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের কথা কুরআন বিরোধী নয়। আমরা যদি শুধু কুন-ফাইয়াকুনকে সামনে রেখে এবং 'ফাইয়াকুন' এর অর্থ ধরি যে 'তক্ষুণি হয়ে গেল' তাহলে বিজ্ঞানে কুরআনে অবশ্যই গরমিল মনে হবে কিন্তু সুরা হা-মিম, আস-সাজদার ৪র্থ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩য় আয়াত, সূরা হুদের ৭ম আয়াত, আল ফুরকানের ৫৯ আয়াত ইত্যাদি আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনের বক্তব্যের মোটেই খেলাফ নয়। তবে খেলাফ শুধু এখানে যে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ পৃথিবীর সৃষ্টির যাবতীয় পর্যায়ক্রমিক

www.draminlibrary.com

ব্যবস্থাপনাকে আপনাআপনি সৃষ্টি হওয়ার কথা বলছেন আর কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিচ্ছেন। যারা সৃষ্টিকর্তাকে মানছে না তাদের উদাহরণ হচ্ছে এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি একটা নৌকা তৈরীর যাবতীয় বাস্তব ব্যবস্থাপনা স্বীকার করে কিন্তু মিস্ত্রি স্বীকার করে না। তাদেরকে আমরা হিসাবের বাইরে ধরে যদি তাদের পৃথিবী সৃষ্টির চিন্তা-ভাবনাটাকে সামনে রেখে কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ক'টির সঙ্গে মিল করে দেখি তবে দেখব যে, ওদের (বিজ্ঞানীদের) চিন্তার ধারাটি ঠিকই আছে।

পৃথিবী কি সূর্য থেকে সৃষ্ট

সূর্য ও পৃথিবী কি পৃথকভাবে সৃষ্টি, নাকি সূর্য থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি এটা এমন এক প্রশ্ন যে, এ প্রশ্নের মূল তাৎপর্য বুঝতে ভুল করেই অনেকে মনে করেন 'সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি' একথা মানলে আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু আসল ব্যাপার বুঝলে আল্লাহকে অস্বীকার করার কিছুই নেই এর মধ্যে; যেমন গাছ থেকে ফল, মা থেকে সন্তান, মুরগীর পেট থেকে ডিম এসব কথা মানলে যেমন আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় না ঠিক তেমনই সূর্য থেকে পৃথিবী এ কথা মানলেও আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় না। মা থেকে সন্তান গাছ থেকে ফল, এসব যেমন আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধান ঠিক তেমনই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধান হচ্ছে একই মূল বস্তু থেকে সব কিছুর সৃষ্টি। যেটাকে আল্লাহ বলেছেন وَهِيَ دُخَانٌ ওটা প্রথমে ধোঁয়ার ন্যায় ছিল তার থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। এবার দেখুন একটা যুক্তি দিচ্ছি যার থেকে প্রমাণ হবে যে, সূর্য থেকেই পৃথিবী সৃষ্টি এবং পৃথিবী থেকেই চাঁদের সৃষ্টি। (আমার এ যুক্তি বিজ্ঞানকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধানকে বুঝার ও বুঝানোর উদ্দেশ্যে।) আল্লাহ বলেন, 'লান তাজিদা লিসুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা' আল্লাহর কোন বিধানের মধ্যে কোন পরিবর্তন পাবে না। এই আয়াতের তাৎপর্য বুঝানোর জন্যেই আমার এ যুক্তির অবতারণা করা মাত্র। আল্লাহর এসব বিধানের মধ্যে একটি বিধান হচ্ছে 'গতি জড়তা' অর্থাৎ গতিশীল কোন কিছুর উপর যা থাকে তাতে ঐ গতি জড়িয়ে যায়। যেমন আপনি যখন ট্রেনে খুব দ্রুত গতিতে চলছেন তখন একটা ডাবের পানিটুকু পান করে তাকে জানালা দিয়ে ঠিক সোজা নিচের দিকে অনায়াসে ছেড়ে দিন,

www.draminlibrary.com

দেখবেন ডাবটা সোজা নিচের দিকে না গিয়ে ট্রেন যে-গতিতে সামনে ছুটতেছিল সেই একই গতিতে ঐ ডাবের খোসাটা ট্রেনের গা ঘেঁষে দ্রুত বেগে সামনের দিকে এগোতে এগোতে মাটিতে গিয়ে পড়ে সামনের দিকে ছিটকে চলে যাবে আরও খানিকটা সামনের দিকে। মনে হবে যেন সে (ডাব) ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই এগোতে চাচ্ছে। সে যেন মাটিতে পড়ে সেখানে থাকতে চাচ্ছে না, সে ট্রেনের মায়া কাটাতে পারছে না, এর কারণ কি? এর কারণ হলো, ঐ ডাবটা যেহেতু ট্রেনের মধ্যে ছিল তাই ট্রেন যে গতিতে চলতেছিল সেই গতিটাই ঐ ডাবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ফলে সে ঐ গতিতে সামনের দিকে এগোচ্ছিল এবং নিচে নামতে ছিল। (ঐ ডাবের প্রতি যদি মধ্যাকর্ষণের বল প্রয়োগ না হত তবে ঐ একই গতিতে ডাব সামনে ছুটতে থাকতো।) এরই নাম গতিজড়তা। আর এরই কারণে ডাবটাকে অনায়াসে ছেড়ে দিলেও মাটিতে পড়ে সামনের দিকে ছিটকে যাবে। একই কারণে বাসে চলতে চলতে যদি হঠাৎ বাস ব্রেক করে তবে বাসের প্রত্যেক যাত্রী সামনের দিকে ঝুকে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বাস যে গতিতে চলতেছিল ঠিক সেই গতিটাই জড়িয়ে গিয়েছিল বাসের সব যাত্রির গায়ে। ফলে বাসকে ব্রেক করার কারণে বাসকে আসলে পিছন থেকে টেনে ধরা হয় কিন্তু যাত্রিদের যেহেতু বাসের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়া থাকে না এবং তাদেরকে পিছন থেকে কেউ টেনে ধরে না, ফলে তার গায়ে যে গতিটা জড়িয়ে যায় সেই গতিতে সে সামনে চলতে থাকে কিন্তু নিচু থেকে বাসকে ব্রেকের মাধ্যমে টেনে ধরা হয় ফলে বাসের সব কিছুই সামনে ঝুকে পড়ে। ওটা সামনে ঝুকে পড়া নয়, ওটা হচ্ছে একই গতিতে চলতে থাকা। ঠিক এই একই কারণে দ্রুতগামী সাইকেলের সামনের চাকায় ব্রেক করলে পিছনের চাকা উচু হয়ে পড়ে; কারণ পিছনের চাকায় যে গতি ছিল সেই গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ যদি সামনের চাকা বন্ধ হয়ে যায় তবে পিছনের চাকা বাঁধা পেয়ে উঁচু হয়ে পড়ে। এ জন্যেই দ্রুতগামী সাইকেলকে ব্রেক করতে হলে পিছনের চাকায় ব্রেক করতে হয়।

ঠিক ঐ একই কারণে কোন গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ সামনের চাকা খুলে গেলে পুরা গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে পারে না কারণ তাতে যে গতি থাকে ঐ গতিই গাড়িটাকে সামনে ছুড়ে দেয়। ফলে সামনের চাকা বন্ধ হয়ে

www.draminlibrary.com

যাওয়ার কারণে গাড়ি উল্টে যেতে বাধ্য হয়। ঠিক একই কারণে খুব দ্রুতগামী গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করলে সব যাত্রী সামনের দিকে ছিটকে যায় কারণ যাত্রীর গতি ঠিকই থাকে কিন্তু গাড়ির গতি বন্ধ করে দেয়া হয়। গতি জড়তা বুঝানোর জন্যে বহু কথা এখানে বলা হল এবং একই কথা বার বার বলা হল। আশা করি, এখন আমরা গতিজড়তা বুঝতে পেরেছি। এবার চিন্তা করুণ একটা হেলিকপ্টার যদি সোজা উপরে উঠে গিয়ে ১ ঘন্টা একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে ঐ ১ ঘন্টায় পৃথিবী তার আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে গিয়ে ১০৪১ মাইল পূর্ব দিকে চলে যাবে। ঐ সময় হেলিকপ্টারকে ১০৪১ মাইল পিছনে চলে যাবার কথা ছিল। কারণ হেলিকপ্টার তো আর পৃথিবীর গায়ে নেই, সে রয়েছে পৃথিবীর গা ছেড়ে দিয়ে মহাফাঁকার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তা যায় না, কেন যায় না? কারণ হেলিকপ্টারটা ছিল পৃথিবীতে ফলে পৃথিবীর যে গতি তা ওর সঙ্গে ছিল জড়িয়ে। কাজেই যদিও সে উপরে ছিল কিন্তু গতি জড়তার কারণে পৃথিবীর গতিতে সে পৃথিবীর সঙ্গে সমানে চলতেছিল; তাই হেলিকপ্টার যতক্ষণ পরেই পৃথিবীর মাটিতে নামুক না কেন যেখান থেকে উঠেছিল সেখানেই নামবে। এই একই কারণে প্লেনে করে মানুষ যেখান থেকে যে দিকেই উড়ুক না, উপরে উঠার কারণে পৃথিবীর গতি উড়ন্ত প্লেনের উপর থেকে এক চুল পরিমাণও কম বেশি হয় না। ফলে প্লেন পূর্ব দিকে উড়লেও ঘন্টায় যতদূর যাবে পশ্চিম দিকে উড়লেও ঐ একই গতিতে ঘন্টায় তত মাইলই চলবে। কারণ পৃথিবীর গতি প্লেনে সব সময়ই সম পরিমাণ থাকে।

এবার চিন্তা করুন পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে বছর পুরতির জন্য যখন সূর্যের চারপাশের প্রায় ৬২ কোটি মাইলের একটা পথ অতিক্রম করে তখন পৃথিবীকে চলতে হয় প্রতি মিনিটে প্রায় ১২ শত মাইল। এভাবে চললে চাঁদকে তো ছয় মাসে ৩০ কোটি মাইল পিছনে ফেলে পৃথিবীর দূরে সরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা সরে না কেন? সরে না এই জন্যে যে পৃথিবী সূর্যের চার পার্শ্বের ডিম্বাকৃতির ৬২ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীকে যে গতিতে চলতে হয় ঠিক ঐ একই গতিতে চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে তার দূরত্ব ঠিক রেখেই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। এখন প্রশ্ন, পৃথিবীর বার্ষিক গতি আর চাঁদকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলার গতি ঠিক কাঁটায়

www.draminlibrary.com

কাঁটায় এক হল কি করে? এখানেও ঐ একমাত্র কারণে এই দুইটা গতি এক হতে পারে, সে কারণটা হল, ঐ চাঁদটাকে হেলিকপ্টারের মত এই পৃথিবী থেকে উপরে উঠতে হবে, তাহলেই গতি জড়তার নিয়ম অনুযায়ী চাঁদ সমগতিতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে পারে, এছাড়া আর কোন ২য় কারণই আল্লাহর তৈরি আইনের নিয়মে পড়ে না, যে নিয়মের মাধ্যমে চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে একই গতিতে আবহমানকাল ধরে ছুটতে পারে। এইটাই আল্লাহর তৈরি বিধান, যে বিধানের মধ্যে রয়েছে গতি জড়তা, আর যার কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি হলেই চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে থাকা সম্ভব, নইলে নয়। এরপর যদি কেউ বলতে চান যে আল্লাহর নিকট সবই সম্ভব তাহলে আমি বলব আল্লাহর নিকট তো সবই সম্ভব এ কথা ষোল আনা সত্য কিন্তু একটা গাছের ফল বোটা থেকে ছিঁড়ে গেলে আল্লাহ কি ঐ ফলটাকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারেন না? এটা কি আল্লাহর কাছে অসম্ভব? অসম্ভব তো অবশ্যই না, তবে তা যায় না কেন? এর উত্তরে যেমন বলতে হবে ওটা আল্লাহর বিধান। ঠিক তেমনই পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি, এটাও আল্লাহর বিধান। এই যে আটলান্টিক মহাসাগরের বিরাট গভীরতা, হয়ত হতে পারে কোটি কোটি বছর পূর্বে আল্লাহ পাক কোন বিস্ফোরণের মাধ্যমে পৃথিবীর খানিকটা অংশকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ফলে পৃথিবীর গতি চাঁদের গায়ে লেগে রয়েছে নইলে এপোলো ১১ এ করে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে তারা জীবনেও কোন দিন আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারত না। শুধু তাই নয়। পৃথিবীর কোন একটি প্রাণীও কোন দিনই চাঁদের সন্ধান পেত না যদি না চাঁদের সৃষ্টি পৃথিবী থেকে হত।

এর পর প্রশ্ন, সূর্য যখন তার নিজস্ব কক্ষপথে ভীষণ বেগে ছুটছে তখন পৃথিবী কি করে তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সূর্য যখন তার কক্ষপথে এক নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলছে অনবরত তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ক্রমেই বাড়ত এবং কবে সূর্যকে একটা ছোট্ট তারকার মত দেখা যেত এবং বহু বছর পরে এমন একদিন আসত যেদিন অন্ততঃ এ সূর্য তো দেখা যেতোই না, হয়ত অপর কোন সূর্যের দেশে পৃথিবী ঢুকে পড়তো কিন্তু তা কেন হচ্ছে না? হচ্ছে না ঐ একই কারণে। কারণটা হল এই যে, সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হলে গতি জড়তার আইন অনুযায়ী সূর্যের গতি পৃথিবীতে লেগে থাকবে আর

www.draminlibrary.com

তাতে ফল হবে এই যে, পৃথিবী সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে বাধ্য থাকবে। কারণ যেদিন সূর্য থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেইদিন পৃথিবী সূর্যের গতিকে সঙ্গে নিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এ কারণেই সূর্য যেদিকেই যাক না কেন এবং যত দ্রুত গতিতেই চলুক না কেন পৃথিবীকে ছেড়ে সূর্যের অন্য কোন দিকে পালিয়ে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই। ঠিক তেমনই পালিয়ে যেতে পারবে না সূর্য থেকে যারা যারা বেরিয়ে আসছে তাদের একটিও। এসব কি আমরা কখনও চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি? এসব কি বিনা ব্যবস্থাপনায় হতে পারে?

১৩নং যুক্তি ঃ

সবকিছুই আল্লাহর ভাণ্ডারে

আমরা এক দিকে শুনি মানুষ বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু যমীন বাড়ছেনা। অপর দিকে আল্লাহর বলেছেন–

وَاِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ *

"সবকিছুর ভাণ্ডার আমার নিকট। আমি প্রয়োজন মত সবকিছুই দিয়ে থাকি।

এইবার দেখা যাক এ দু'টি মতের কোনটা ঠিক। আল্লাহ বলেছেন, সব কিছুর ভাণ্ডার আল্লাহর নিকট এবং প্রয়োজন মত সব কিছুই দিয়ে থাকেন। তাহলে আমরা মানুষ বেড়ে গেলে আল্লাহকেও যমীন বাড়াতে হবে। যদি লোক বৃদ্ধির সাথে সাথে যমীন বাড়তে দেখি তবে তো আল্লাহর কথা না মেনে আর কোন উপায় থাকবে না। আমরা দেখি পৃথিবীতে এমন অনেক পাহাড় পাওয়া গিয়েছে যার উপর বহু বহু বছর পূর্বের সামুদ্রিক জানোয়ারের হাড় বা কংকাল পাওয়া গিয়েছে এবং সে সব কংকাল দেখে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন ঐ সব পাহাড় নাকি একদিন সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, পরে পাহাড় গজিয়ে উঠেছে। ফলে দরিয়ার ভিতরের কিছু জলজ প্রাণীর দেহাবশেষ এই সব পাহাড়ের মাথায় এখন পাওয়া যাচ্ছে। ইদানিং শুনছি বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার মধ্যে চাটগাঁর নিম্নদিকে ৪৪ হাজার বর্গমাইলের এক দ্বীপ জেগে উঠেছে। এতে কি আল্লাহ পাকের উপরোক্ত কথার সততা প্রমাণিত হচ্ছে না?

www.draminlibrary.com

ঐ দ্বীপে ইতিমধ্যেই গাছপালা লাগান শুরু হয়ে গেছে। যখন সেখানে লোক বসতি শুরু হয়ে যাবে তখন বাংলাদেশের লোক বসতি হবে প্রতি বর্গমাইলে [৫৬ হাজার বর্গমাইল+ ৪৪ হাজার বর্গমাইল= ১ লক্ষ বর্গমাইল। ১০ কোটি ÷১ লক্ষ বর্গমাইল=] ১,০০০ জন লোক। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে আমরা এখন যেখানে ১৭৮৫ জন লোক বাস করছি সেখানে এই গড়টা গিয়ে দাঁড়াবে ১,০০০ জন এর মধ্যে।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, সবকিছুর ভাণ্ডার আমার নিকট। যখন যা যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় তখন তা সেই পরিমাণ আমি দিয়ে থাকি। পৃথিবীর স্থলভাগ বৃদ্ধির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের এ কথার সত্যতা অবশ্যই প্রমাণিত হলো। এবার দেখা যাক আর কোন দিক থেকে আল্লাহর উপরোক্ত বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা।

আমরা দেখি বাংলাদেশের মানুষ যখন জ্বালানি কাঠের চিন্তায় অস্থির ছিল তখন হঠাৎ করে আল্লাহ পাক তিতাস গ্যাসের সন্ধান মিলিয়ে দিলেন, ফলে কোটি টাকার জ্বালানির অভাব থেকে আমরা মুক্তি পেলাম।

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ওয়াদাই রয়েছে যে, যখন যা যে পরিমাণ প্রয়োজন হবে তা পূরণ করার দায়িত্ব আল্লাহরঃ তাহলে দেখা যাক খাদ্যের অভাব পূরণ করার কোন ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন কিনা। আমরা ভৌগলিক হিসাব ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি যে, পৃথিবীর স্থলভাগ সমভাবে ভাগ করলে এখনও মাথা পিছু প্রায় ৮ একর করে পড়বে। এ পরিমাণ জমিতে যদি সর্বনিম্ন হারেও ফসল উৎপন্ন হয় তবু বর্তমানের জনসংখ্যা অনুপাতে খাদ্য ঘাটতি থাকার কথা নয়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই যে আল্লাহ্ যমীন দিয়েছেন, যমীনে উর্বরা শক্তি দিয়েছেন। গাছের খোরাক নাইট্রিক এ্যাসিড আকাশ থেকেই পানির সংগে মিশিয়ে আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষাণ। কিন্তু জমি চাষ করার ও বীজ বোনার দায়িত্ব আল্লাহর নয়, তা মানুষের। ঠিক তেমনই তিতাস গ্যাস দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব কিন্তু পাইপ বসিয়ে মানুষের রান্নাঘর পর্যন্ত সে গ্যাস পৌছে দেয়া মানুষের দায়িত্ব। তেমনই এই পৃথিবীতেই পৃথিবীর মোট মানুষের উপযোগী খাদ্যের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা আল্লাহর দায়িত্ব কিন্তু খাদ্য উৎপাদন ও তা সম বন্টনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের নিকট পৌছে দেয়া মানুষের দায়িত্ব।

www.draminlibrary.com

বলাবাহুল্য এই সব দায়িত্ব পালনের জন্যেই থাকে সরকার। এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ....

"এবং আল্লাহ আকাশে যেমন ন্যায় দণ্ড ও ভারসাম্য কায়েম করেছেন তোমরাও তেমন কর।" অর্থাৎ (১) আকাশ থেকে তোমরা যে সূর্যের কিরণ, বৃষ্টির পানি, চাঁদের আলো ও আকর্ষণ যেমন প্রত্যেকেই সমানভাবে পাও তেমন জাতীয় সম্পদের ভাগটাও জনগণকে সমানভাবে ভাগ করে দাও, (২) আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রত্যেকেরই যেমন নিজস্ব আকর্ষণ ও অবস্থান থাকার কারণে একটি অন্যটিকে আকর্ষণ করে নিজের মধ্যে টেনে নিতে পারে না তেমন দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব সহায়-সম্বল, ঘর-বাড়ি ও স্বাধীন সত্তা থাকতে হবে যেন কেউ কাউকে আকর্ষণ করে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে গোলাম বানাতে না পারে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহর পৃথিবীতে রয়েছে এবং সেগুলিকে আল্লাহ ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে দিতে বলেছেন। যদি আমরা সারা পৃথিবীর মানুষ গোটা পৃথিবীকে 'কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুল্‌ক– বল, হে আল্লাহ তুমিই এ বিশ্বজাহানের বাদশাহ বলে মেনে নিয়ে পৃথিবীর জায়গা জমি ও পৃথিবীর ধন-সম্পদ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্টন করে দিতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই কোন দেশকেই বাড়তি জনসংখ্যা চিন্তা করতে হতো না। যেমন দেখুন অস্ট্রেলিয়া একটি মহাদেশ হওয়া সত্ত্বেও তার লোক সংখ্যা বাংলাদেশের লোকসংখ্যার দশ ভাগের একভাগ। আরব দেশ ২৫টা বাংলাদেশের সমান জায়গা হওয়া সত্ত্বেও তার লোক সংখ্যা আমাদের দশ ভাগের এক ভাগ। কানাডা, বাংলাদেশ অপেক্ষা প্রায় ৭৫ গুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও এর লোকসংখ্যা প্রায় বাংলাদেশের অর্ধেক। পৃথিবীতে এমন বহু দেশ আছে যাদের লোকসংখ্যা বাংলাদেশের যে কোন একটা জেলার লোকসংখ্যার চাইতেও কম। এই হিসাব মুতাবিক প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়েনি। বেড়েছে শুধু বাংলাদেশের লোকসংখ্যা।

www.draminlibrary.com

মানুষের খাদ্য সমুদ্রে

আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا *
(النحل- ١٤)

'তিনি (আল্লাহ) সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন যেন তা থেকে তোমরা টাটকা মাংস খেতে পার।" আন-নাহাল ঃ ১৪

এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, আমরা সমুদ্র থেকে যে মাছ খাই তাকে আরবীতে বলে سَمَكٌ ছামাকুন। আর لَحْمٌ লাহমুন বলতে বুঝায় মাংস। এ মাংস এখনও আমরা সমুদ্র থেকে খুজে বের করতে পারিনি। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্র থেকে হয়ত এমন খাদ্য আবিষ্কার হবে যার টাটকা মাংসের যাবতীয় উপাদান থাকবে।

১৪নং যুক্তি ঃ

আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

দেখুন, মানুষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ আর আল্লাহ করেন সৃষ্টিনিয়ন্ত্রণ। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন, "যা যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় তা সেই পরিমাণই দিয়ে থাকি।" এর থেকে আরও বুঝা যায় যে, আমরা যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করি, ওটার দায়িত্ব আসলে আল্লাহ নিজেই নিজের উপর নিয়ে রেখেছেন। এবার দেখা যাক আল্লাহর এ কথার সত্যতা বাস্তবে মেলে কিনা এবং তার সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ কেমন।

وَاِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ عِنْدَنَا *

এটা পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, আল্লাহর সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে তিনি যত প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ প্রজনন শক্তি এবং গাছের মধ্যে রয়েছে বংশবৃদ্ধির অজস্র উপাদান। প্রাণীর মধ্যে যে পরিমাণ প্রজনন শক্তি রয়েছে যদি সেই পরিমাণ শক্তি অনুযায়ী বংশ বিস্তার হতে পারতো তবে মাত্র ১ জোড়া প্রাণীর বংশে কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর স্থলভাগ এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যেত যে অন্য কোন প্রাণীর জন্যে

www.draminlibrary.com

এক বর্গ ইঞ্চি জায়গাও খালি পাওয়া যেত না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, একটা পুরুষের দেহ থেকে '১ বারে যে পরিমাণ বীর্য নির্গত হয় তাতে ৩০/৪০ কোটি নারী গর্ভবতী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে বলে সে সুযোগ নেই। আবার দেখুন একটা সন্তানের দেহ তার মায়ের পেটে বিন্দু থেকে শুরু করে গর্ভকালীন ৯ মাসে যে হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে যদি সেই একই হারে মাত্র ২১ বছর মানবদেহ বৃদ্ধি পেতে থাকতো তবে তার দেহের আয়তন সারা পৃথিবীর আয়তনের সমান হয়ে যেত, কিংবা ১টা ছেলে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত যে হারে লম্বা হয় সে হারে লম্বা হতে থাকলে যার বয়স ২০×৪=৮০ বছর হয়েছে তার দেহের দৈর্ঘ হত ৩×৪ ১/২ =১৪ হাত, কিন্তু তা হয় না কেন? কারণ সব কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তাই হয় না।

দেখুন, সমুদ্রে Star Fish নামে এক প্রকার মাছ আছে যারা এক বারে ২০ কোটি ডিম দেয়। যদি তাদের মাত্র ১টি মাছের বংশ বৃদ্ধি হতে দেয়া যেত তবে মাত্র ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে এক বর্গইঞ্চি জায়গাও (অন্য কোন প্রাণকে দাঁড়ানোর জন্যে) খালি থাকতো না। এসব ব্যাপারে কি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ নেই?

পৃথিবীতে এক প্রকার উদ্ভিদ আছে যার নাম সিসিস্ত্রীয়াম সোফিয়া। এ জাতীয় গাছের একটি চারা গাছেই একেবারে সাড়ে সাত লাখ বীজ দেয়। যদি এর মাত্র একটি গাছের বংশ বৃদ্ধির সুযোগ মিলতো তবে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর স্থলভাগ এই এক জাতীয় গাছেই ছেয়ে যেত। আরও লক্ষ্য করুন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে জীবিত জীবের জীবকোষের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ক্ষমতা এত বেশি যে, তাকে সীমাহীন বলা চলে। এমনকি Unicelluler Organism নামীয় জীবকোষের সম্প্রসারণ ক্ষমতা এত বেশি যে যদি রীতিমত তার খাদ্য সরবরাহ হয় এবং তার নিজেকে পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকে তবে মাত্র ৫ বছরের মধ্যেই এত পরিমাণ জীবকোষের সৃষ্টি হতে পারে যে, তার মিলিত আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১০ হাজার গুণ বেশি হতে পারে। এবার চিন্তা করুন যদি এর পিছনে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকতো তবে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবী টিকতে পারতো কি? এবং আমরা এ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণের কোন সুযোগ পেতাম কি?

www.draminlibrary.com

১৫নং যুক্তি ঃ

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ

এবার আসুন ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের উপর কিছুটা চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। ডারউইনের মতে আমরা নাকি ক্রমবিকাশবাদের ধারা মুতাবিক—ব্যাঙ, বানর ও বন-মানুষের পর্যায় পার হয়ে মানুষ হয়ে পড়েছি। তাই যদি হয় তবে আমার প্রশ্নঃ

১। যতদিন থেকে ইতিহাস সংরক্ষিত হচ্ছে ততদিনের মধ্যে কোন একজন মানুষের সামনেও কেন একটা বানর মানুষ হলো না? অর্থাৎ হাজার হাজার বছরের মধ্যে একটা লোকও কেন দেখলো না যে, তার সামনে একটা বানর মানুষ হয়ে গেল? তাঁরা বলবেন, 'যা হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে তা কি করে একটা মানুষ চোখে দেখবে? সেখানে আমার প্রশ্নঃ হাজার হাজার না হয়ে লাখ লাখ বছরে হোক কিন্তু পরিবর্তন হয়ে হয়ে বানর ও মানুষের মাঝপথে এসে গেছে এমন অবস্থায় তো দেখা যাবে? তাও কি যাচ্ছে? অথচ শুয়া পোকা থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেই একটা প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। আমরা যেমন দেখি শুয়া পোকা থেকে প্রজাপতি তেমন যদি বানর থেকে মানুষ হতো তাহলে উচিত ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে শুয়া পোকা থেকে যেমন প্রজাপতি হয় তেমন একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেই বানর থেকে একটা মানুষ হওয়া। কিন্তু তা কেন হয় না? তাহলে কি বলতে হবে যে বানর থেকে যারা মানুষ হয়েছে তারা বহু পূর্বের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে গেছে, আর হবে না। তাহলে আমার পুনঃ প্রশ্ন যে এককোষা প্রাণী থেকেই যদি আমরা মানুষ হয়ে থাকি তবে কোটি কোটি বছর পার হয়ে যাওয়ার পর আজও কেন সে এককোষা প্রাণী রয়েছে? তারা পরিবর্তিত প্রাণীতে এখনও কেন রূপান্তরিত হচ্ছে না। তাছাড়া—

ক্রমবিকাশবাদের থিওরী বলে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার ধারা। কিন্তু প্রথম অবস্থা (First Cause) যার থেকে বিবর্তন শুরু হয় তার সৃষ্টি হল কি করে? এর জবাব কিন্তু আজ পর্যন্তও কেউ দিতে পারেনি। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এ প্রশ্নের জবাব কেউই কোন দিন দিতে পারবে না।

www.draminlibrary.com

বানরের লেজ খসে মানুষ?

বিজ্ঞান বলে নিষ্প্রয়োজনে বানরের লেজ খসে গেছে। তাই যদি হয় তবে এখন তো মানুষের পাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সে পাখা কেন গজাচ্ছে না? যদি এমন হয় যে, যা একবার খসে পড়ে তা প্রয়োজনের তাগিদে পুনরায় গজায় না। তাই যদি হয় তবে বানরের পূর্ব অবস্থায় তো লেজ ছিল না বানর সে লেজ পেল কি করে? এই উদ্ভট মতকে ব্যঙ্গ করে ডঃ মুহঃ শহীদুল্লাহ 'ভবিষ্যতের মানুষ' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানীদের উক্ত থিওরী ঠিক হলে ভবিষ্যতে মানুষের শুধু মাথাটাই থাকবে এবং তা আরও খানিকটা বড় হয়ে পড়বে। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন এ থিওরীও টিকছে কি?

এসব যুক্তিগুলি আল্লাহ খণ্ডন করে দিয়ে বলেছেন–

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ * ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ*
(الواقعة- ٥٨-٥٩)

তোমরা কি লক্ষ্য করে দেখনা যে বীর্য তোমরা নিক্ষেপ কর তা কি? (অর্থাৎ কি ধরনের গুণ ও শক্তি সম্পন্ন) তা তোমরা কি নিজেরাই সৃষ্টি করতে পার? নাকি আমি সৃষ্টি করে থাকি?...... এর মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন বীর্যের দিকে লক্ষ্য করতে বা পরীক্ষা করতে। সে পরীক্ষায় ধরা পড়লো বীর্যের মধ্যে এমন কিছু নির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে যার থেকে পিতার ও মাতার অনুরূপ একটা সন্তান হতে পারে। অর্থাৎ পিতা মাতার লেজ থাকলে তাদের বীর্যের মধ্যে লেজ তৈরির উপাদান থাকবে এবং লেজ তাতে তৈরি হবে কিন্তু যদি পিতা মাতার বীর্যের মধ্যে লেজের বা শিং এর কোন উপাদান না থাকে তবে তাদের সন্তানদের লেজ, শিং ইত্যাদি হবে না। এমন কি আমরা দেখছি পিতা-মাতার গায়ের রংটাই নয় শুধু, বরং চোখের মনির রংটাও পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুরূপ হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এই বিধানই ডঃ ফ্রয়েডের পরীক্ষায় ধরা পড়ল। তিনি বললেন, "পিতার বীর্যে লেজের উপাদান না থাকলে তার সন্তানের লেজ হবে না।" ফলে ডারউইনের থিওরী ডঃ ফ্রয়েডের থিওরী দ্বারা খণ্ডিত হয়ে গেল। তবুও তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে, বানর থেকে মানুষ; তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, দেহের অঙ্গ

www.draminlibrary.com

প্রত্যঙ্গের সঙ্গে বানর ও মানুষের মধ্যে না হয় সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে। বানরের মধ্যে মানুষের ন্যায় বাক শক্তি নেই, বিবেক, বিবেচনাবোধ নেই, মানুষের ন্যায় লজ্জা-শরম নেই, গর্ব-অহংকার নেই কিন্তু মানুষের মধ্যে তা আছে। এগুলি মানুষের মধ্যে এলো কোত্থেকে বিকাশ লাভ করে?

১৬নং যুক্তি ঃ

জীবের বৈশিষ্ট্য

(ক) জীবের চেহারা সুরাত

আমরা দেখি যাকেই চেনার প্রয়োজন আছে তাদেরই চেহারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখি মানুষ নিজ হাতে যে বস্তু তৈরি করে তাদের এক বিশেষ ধরনের প্রত্যেকটি বস্তু বা যন্ত্র একই প্রকার হয় যেমন মানুষের তৈরি থালা, বাটি, গ্লাস, দা, খুন্তা, কুড়াল ইত্যাদির চেহারা সুরত একই প্রকার হয়। কিন্তু আল্লাহর তৈরি মানুষের চেহারা একটার সঙ্গে অন্যটির মিল নেই। যদি এখানে চেহারার পার্থক্য আল্লাহ পাক না সৃষ্টি করতেন তা হলে, কে মা, কে বোন, কে স্ত্রী, কে পিতা, কে বন্ধু, কে শত্রু, কে আমার দেশের প্রেসিডেন্ট, কে আমার দেশের চরম শত্রু রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এর কিছুই টের পাওয়া যেত না। ফলে মানব সমাজ অচল হয়ে পড়তো। তাই প্রত্যেক মানুষের চেহারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে প্রত্যেককে চেনার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। আবার দেখুন আল্লাহর কি বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা যে, যে সব গৃহপালিত পশু-পক্ষী মানুষের মালিকানায় রয়েছে সেগুলি যেহেতু চেনার প্রয়োজন আছে তাই তাদের চেহারার মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু পানির মাছ যেহেতু কারও মালিকানায় নেই তাই তাদের চেহারার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মানবজাতির প্রয়োজনে তাদের চেহারার সৃষ্টির কথা আল্লাহ এই ভাবে বলেছেন যে— فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ

"তিনি তার ইচ্ছা মুতাবিক যাকে যে চেহারায় খুশি সৃষ্টি করেছেন।"

(খ) দৃষ্টিশক্তি

আল্লাহ মানুষের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির একটা ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছেন। মানুষের যা দেখা প্রয়োজন তাই মানুষ দেখে আর যা

www.draminlibrary.com

দেখার প্রয়োজন নেই, বরং দেখলে ক্ষতি হবে, তা মানুষ দেখে না। যেমন মানুষ পানি দেখতে পায় কিন্তু বায়ু দেখতে পায় না। মাছের নিকট পানি যেমন মানুষের নিকট বায়ু তেমন। মানুষ যা দেখে তা অন্য যে কোন দেখার মত জিনিসকে আড়াল করে। যেমন পানিকে দেখা যায় বলেই পানির মধ্যে ডুব দিয়ে চেয়ে দেখলে পানি চোখের উপর এসে আড়াল করে ফলে পানির মধ্যেকার আর কিছুই দেখা যায় না। বায়ুকে আল্লাহ দেখার মত কোন বস্তু বানালে মানুষ চেয়ে শুধু বায়ুই দেখতে পেত, আর কিছুই দেখতে পেত না। শুধু তাই নয় মানুষ বায়ুর মধ্যকার কোন গ্যাসীয় পদার্থও দেখতে পায় না এবং জিনও দেখতে পায় না। এবার চিন্তা করুন মানুষের যা দেখলে উপকার, তাই দেখে আর যা দেখলে তার ক্ষতি, মানুষ তা দেখতে পায় না। এরও পিছনে কি কোন পরিকল্পনা নেই?

(গ, ঘ) গলার আওয়াজ ও শ্রবণশক্তি

আওয়াজ শোনার ব্যাপারেও আল্লাহর বহু প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা রয়েছে। দুনিয়ার মানুষ বহু প্রকার আওয়াজ তৈরির যন্ত্র তৈরি করে যেমন সাইকেলের বেল, রেল গাড়ির হুইসেল, মটর বাসের হর্ণ—ইত্যাদি ধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে আওয়াজ করা হয়। কিন্তু কোন আওয়াজ শুনেই মানুষ বলতে পারেনা যে কোন গাড়ির হর্ণ বা কোন সাইকেলের বেল বা কোন বাঁশীর আওয়াজ। তা কেউ বলতে পারে না। কারণ মানুষের তৈরি আওয়াজ যন্ত্রের মধ্যে মানুষ কোন বিভিন্নতা সৃষ্টি করতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহর তৈরি মানুষের গলার আওয়াজে তা রয়েছে। সাইকেলের প্রত্যেকটি বেল থেকে যেমন একই প্রকার ক্রিং ক্রিং আওয়াজ আসে তেমন যদি প্রত্যেকের গলা থেকে একই প্রকার আওয়াজ আসতো তবে রাতের বেলা কেউ গিয়ে যখন দরজা খুলে দেয়ার জন্যে ঘরের লোকদের ডাক দিত তখন সে ব্যক্তি কি প্রকৃতই বাড়ির মালিক না চোর ডাকাত না চরম শত্রু তা বুঝা যেত না। তাই মেহেরবান আল্লাহ মানুষের গলার আওয়াজকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন গলার আওয়াজ শুনেই মানুষ বুঝতে পারে যে কে ডাকছে। এছাড়া আওয়াজ তৈরির আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও কর্ণ কুহরের পাতলা পর্দায় বোধগম্য শব্দ হিসাবে তা ধরা পড়া এসব কি আপনা আপনিই হতে পারে? বরং এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে মানুষের মন আপছে বলে উঠবে—

www.draminlibrary.com

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

তিনি সব কিছু করার জন্যেই ক্ষমতা রাখেন। আর ক্ষমতা রাখেন বলেই তিনি এতসব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। এইসব বিষয়ে মানুষ যেন চিন্তা ভাবনা করে সে জন্যে আল্লাহই বলেছেন—

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا *

অবশ্যই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং মনোবৃত্তি এর প্রত্যেকটির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে। অর্থাৎ পরকালে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও মনোবৃত্তি দিয়েছিলাম এসবের কি সদ্ব্যবহার করেছিলে?

১৭নং যুক্তি ঃ

আকাশের ভাসমান মেঘের হাকিকত

يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * "ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ" ..... কুরআন যেমন বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ঠিক তেমন সৃষ্টির যেখানে দৃষ্টিপাত করা যাবে সেখানেই দেখা যাবে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। এই কারণেই আল্লাহ বলেন—

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ *

'চেয়ে দেখ আল্লাহর সৃষ্টির দিকে। কোন অবিজ্ঞোচিত টুটাফাটা ধরনের কোন কিছু তার সৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাও কি?" তা পাবে না বরং যতই দেখবে ও চিন্তাভাবনা করবে ততই ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল কিছুই তুমি বুঝে কুলাতে পারবে না। আল মুলুক ঃ ৩

দেখুন সূর্যের কিরণে প্রথমে উত্তপ্ত হয় যমীন। যমীন থেকে সে কিরণ ক্রমে উপরে ওঠে আর অল্প অল্প করে শীতল হতে থাকে। আল্লাহর এমন ব্যবস্থা যে বায়ু যত উত্তপ্ত হবে ততই হালকা হবে ও জলীয় বাষ্প ধারণ করবে। আর যতই বায়ু ঠাণ্ডা হবে ততই সংকুচিত হবে ও জলীয় বাষ্প ছেড়ে দেবে। সূর্যের কিরণে যমীন যেহেতু উত্তপ্ত হয়ে যমীনের উপরিভাগ প্রায় মাইল খানেক পর্যন্ত সর্বদাই উত্তপ্ত থাকে তাই এই অংশের মধ্যে বায়ু শীতল

www.draminlibrary.com

হতে পারে না; ফলে সংকুচিতও হতে পারে না। আর বায়ু সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত জলীয় বাষ্পও বায়ু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না; ফলে প্রায় ১ মাইলের মধ্যে মেঘ সৃষ্টি হতেই পারে না। আর যেহেতু উপরে তাপ কম তাই জলীয় বাষ্প বহন করে বায়ু উপরে উঠলেই তা শীতল হয়ে সংকুচিত হয়, ফলে জলীয় বাষ্প আর সে ধরে রাখতে পারে না; ছেড়ে দেয়। আল্লাহ পাকের এই বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই মেঘ উপরে হয় নীচে হতে পারে না।

১৮ নং যুক্তি ঃ

মেঘের পানি সম্পর্কে

বৃষ্টির কারণ সম্পর্কে আমরা জানি যে বায়ু বিশেষ নিয়মে উত্তপ্ত হয়ে সম্প্রসারিত হয়ে জলীয় বাষ্প ধারণ করে এবং সে জলীয় বাষ্প বায়ুর সঙ্গে উড়ে উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং আরও ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয়ে জলীয় কণাগুলিকে একত্রিত করে দেয়। ফলে পানির একটি ফোঁটা তৈরি হলেই তাকে মধ্যাকর্ষণ যমীনে টেনে নিয়ে আসে। এ ব্যবস্থা আপনা আপনিই হতে পারে না। এর পিছনেও যে একটা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা বোঝানোর জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন—

افرء يتم الماء الذى تشربون * ءانتم انزلتموه من المزن
ام نحن المنزلون* (الواقعة - ٦٩-٦٨)

"তোমরা যে পানি পান কর তার দিকে লক্ষ্য করে দেখনা যে আমি কোন বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেঘ তৈরি করি এবং তার থেকে পানি বর্ষাই। এই নিয়ম-পদ্ধতিতে কি তোমরা মেঘ তৈরি করে নিয়ে পানি বর্ষাতে পার? নাকি আমি তা করে থাকি?" —আল ওয়াকেয়া ঃ ৬৮—৬৯

আল্লাহ বলেন-

لونشاء جعلنه اجاجا فلولا تشكرون* (الواقعة- ٧٠)

"যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে (যে নোনা পানির ভিতর থেকে মিঠে পানি বাষ্পাকারে তুলে আনি সেখান থেকে নোনা পানি বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে)

www.draminlibrary.com

নোনা পানিই বর্ষাতে পারতাম। (তোমাদের ক্ষতি হবে বলে তা করি না) তবু তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর না।". —আল-ওয়াকেয়া ঃ ৭০

আল্লাহ পানি সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন তা শুধু এক ব্যাপারেই নয় বরং পানি সম্পর্কে চিন্তা করলে আরও বহু জিনিস মানুষের মগজে ধরা পড়ে। যেমন প্রত্যেক তরল পদার্থ জমাট বাঁধলে তা ভারী হয় কিন্তু একমাত্র পানিই জমে বরফ হলে তা হালকা হয় এবং তরল পানির উপর তা ভাসে। যদি বরফও ভারী হয়ে পানিতে ডুবে যেত তবে হিমমণ্ডলের নদী কিংবা মেরু অঞ্চলের সমুদ্রের জমাট পানির বিরাট বড়বড় বরফের খণ্ডগুলি যদি পানির নীচে গিয়ে পড়তো তবে সামুদ্রিক জীব-জানোয়ারগুলো পিষ্ট হয়ে মারা যেত। এর হাত থেকে সামুদ্রিক জীবগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ একমাত্র জমাট পানিকেই তরল পানির উপর ভাসিয়ে রাখেন। এ সব বিষয় চিন্তা করলে কি মন বলবে যে এ সব কোন পরিকল্পিত সৃষ্টি নয়? এ সবও কি কোন বিস্ফোরণের ফল?

আল্লাহ বলেন—

فَاعْتَبِرُوْا يَاأُولِى الْاَلْبَابِ *

হে মস্তিষ্কের অধিকারীগণ, তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। দেখ তোমার চিন্তায় কি ধরা পড়ে।

১৯ নং যুক্তি ঃ

পাকস্থলী সম্পর্কে

এবার আসুন আল্লাহ যে আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন, তাই কিছু চিন্তা-ভাবনা করি। চিন্তা করি পাকস্থলী সম্পর্কে।

দেখুন পৃথিবীতে যত প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষাগার আছে আর সেগুলিতে যত প্রকার বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে মানবদেহের পাকস্থলী তার মধ্যে সব চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। এই পাকস্থলী রূপ কারখানাটির প্রধান কর্তব্য হলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু হতে প্রাণশক্তি সৃষ্টি করা এবং জীবকোষের চাহিদা মিটানোর জন্যে তা দেহের সর্বত্র সরবরাহ করা। মানুষ যা খায় তার কোন খোঁজখবরই সে রাখে না যে পাকস্থলীতে

www.draminlibrary.com

গিয়ে তা কি অবস্থার সৃষ্টি করে। মানুষ চিন্তা ভাবনা ছাড়াই খাদ্যকে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর সে খাদ্য পাকস্থলী রূপ কারখাণায় গিয়ে পাচক রসের সঙ্গে মিশে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় ও তা থেকে সৃষ্টি হয় অসংখ্য অনুপ্রাণ এবং তা সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষে সাপ্লাই হয়ে যায়। সেখান থেকে জীবকোষ আবার যেখানে যতটুকু পাঠান দরকার সেখানে ততটুকু পাঠিয়ে দেয়। এই সব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সবল ও সুস্থ রাখেন। চিন্তা করুন, এই ধরনের কত হাজারও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য ও ঔষধ থেকে পাকস্থলী রূপ কারখানায় যে ভাবে প্রাণশক্তি ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে তা কি কোন দৈবক্রমে হওয়া সম্ভব? তাই আল্লাহ বলেন—

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ *

"অতঃপর মানুষ লক্ষ্য করুক তার খাদ্যের দিকে তা হলে সে আল্লাহকে চিনতে পারবে।" আল্লাহ যখন খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করতে বলেছেন তখন শুধু উপরে বর্ণিত বিষয়ই নয় বরং আরও বহু বহু বিষয়ের প্রতি আমরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহ পাকের কত মহান ব্যবস্থাপনা নিহিত রয়েছে এ খাদ্য ও খাদ্য গ্রহণের মধ্যে। আসুন এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করি।

২০নং যুক্তি ঃ

জিহ্বার কার্য

জিহ্বার দ্বারা আমরা যে শুধু খাদ্য পাকস্থলীতে পাঠাই তাই নয় বরং জিহ্বার দ্বারা সব চাইতে বড় যে কাজটা সংগঠিত হয় তা হলো জিহ্বার স্বাদ। লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যা-ই দেহের জন্য উপকারী তারই স্বাদটা হচ্ছে সুস্বাদ আর যার দ্বারাই মানুষের দেহের ক্ষতি সাধিত হবে তা সবই বিস্বাদের। এমন কোন খাদ্যই নেই যা মানুষের দেহের জন্যে পুষ্টিকর বা উপাদেয় আর তার স্বাদ খারাপ বা মুখে ভাল লাগেনা। এমন কোন কিছুই নেই যা মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকরবে অথচ তা খেতে সুস্বাদু। আল্লাহ কেন জিহ্বায় এ স্বাদ দিলেন? দিলেন এই জন্যে যে খাদ্য গ্রহণের সময় যদি

www.draminlibrary.com

হঠাৎ এমন কোন জিনিস তার খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় যা তার পাকস্থলিতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাহলে তা যেন মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় ধরা পড়ে যায় এবং বিস্বাদের কারণে তা যেন সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মুখ থেকে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলি করে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়। যেমন– (১) কিছু ছোট ছোট পোকা আছে যা দেহের জন্যে বিষ সমতুল্য সেই সব পোকার গায়ে ভীষণ দুর্গন্ধ ও স্বাদে অস্বাভাবিক তিক্ত। (২) যা-ই পুষ্টিকর বা দেহের জন্যে উপাদেয় তা সবই যদিও সুস্বাদু তবুও পাকস্থলি যখন দুর্বল অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য হজম করতে যখন অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সে (পাকস্থলি) জিহ্বাকে জানিয়ে দেয় যে এখন আর কিছু এখানে পাঠিওনা কারণ আমি (পাকস্থলি) এখন দুর্বল। তখন যা-ই সে খেতে যাবে তাই তার মুখে ভাল লাগবে না। (৩) যখন পাকস্থলি দুর্বল বা তাতে অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটে তখন তা জানিয়ে দেয়ার জন্যে জিহ্বার উপরে সাদা রং এর একটা আবরণ পড়ে যায় যা পাকস্থলির অবস্থার কথা বলে দেয়। মাঝে এমনকি জিহ্বার উপরের আবরণের রং যে শুধু সাদাই হয় তা নয় মাঝে খয়ের রং এও পরিবর্তন হয়ে থাকে, এই রং এর বিভিন্নতা তার পাকস্থলির দুর্বলতার বা অসুস্থতার ধরণ কিরূপ তাও বলে দেয়। অর্থাৎ তার কি ছোট-খাট কোন রোগ হয়েছে না কি টাইফয়েড হয়েছে তা জিহ্বা বলে দেয়। এইভাবে প্রতিটি রোগেরই একটা পরিচয় ভেসে উঠে মানুষের চেহারায় বা দেহের উপরি ভাগের যে কোন স্থানে যেন দেহের ভিতরে কি রোগ সৃষ্টি হলো তা চেহারা দেখেই ধরতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। যেমন দেখুন–

(ক) **পেটে কৃমি হয় ঃ** কৃমি রক্ত খেয়ে যখন রক্তশূন্য করে দেয় তখন চোখের শিরাগুলির রং-এ তা ধরা পড়ে,– জিহ্বার স্বাদে ধরা পড়ে, হাতে পায়ের রং-এ ধরা পড়ে।

(খ) **লিভারে জণ্ডিস হয় ঃ** চোখের রং হলুদ হয়ে যায়, চোখ দেখেই মানুষ দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে।

(গ) **কিডনী খারাপ হয় ঃ** এতে প্রস্রাব কমে যায়, শরীর ফুলে ওঠে, মানুষ টের পেয়ে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

www.draminlibrary.com

(ঘ) **প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার যাচ্ছে ঃ** তাতে চিকিৎসা হতে হবে, তার হাত পা ঝিন ঝিন করে, শরীরের উপরিভাগের অর্থাৎ চর্মের মসৃণতা নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষুধা-পিপাসা বৃদ্ধি পায়, তাকে সিগনাল দেয় যে তোমার বহুমূত্র রোগ হয়েছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

(ঙ) **ঠান্ডায় ফুসফুসকে আক্রমণ করেছে ঃ** গলায় নিঃশ্বাসে ও নাকে তা ধরা পড়ে, মানুষ হুশিয়ার হয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এইভাবে প্রত্যেকটি রোগের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে কোন না কোন সিগনালের ব্যবস্থা রয়েছে।

২১ নং যুক্তি ঃ

বায়ুর মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ

বায়ুর মধ্যেও কতগুলি গ্যাসীয় পদার্থ যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে রয়েছে। যার নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যতিক্রম হলেই গোটা বায়ুমণ্ডলীতে আগুন ধরে যেতে পারে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সারা পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই শতকরা হারের যে ব্যতিক্রম হয় না এবং প্রয়োজন মুতাবিক যে হারে রয়েছে যাতে গোটা পরিবেশটাই শান্ত অবস্থায় মানুষ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী হয়ে রয়েছে তা কি কোন মহাশক্তিধরের বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা ছাড়াই সম্ভব? কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তিই বলতে পারে না যে তা সম্ভব।

২২ নং যুক্তি ঃ

শ্বাসযন্ত্র

চিন্তা করুণ শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করে! দেখুন প্রতি মিনিটে ১৪/১৫ বার নিঃশ্বাস নিতে হয় এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিমিত অক্সিজেন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তা যথাস্থানে গিয়ে জীবদেহের প্রয়োজন মিটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেহের জন্যে যা পরিত্যক্ত (গ্যাসীয় পদার্থ) তা বের করে নিয়ে আসে এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য এমন ভাবে চালু থাকে যে, যে

www.draminlibrary.com

গ্যাসটা ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তা আর ভিতরে প্রবেশ করে না, তা সংশোধিত হওয়ার জন্যে সোজা সাপ্লাই হয়ে চলে যায় গাছের পাতায় আর সেখান থেকে সংশোধিত হয়ে পুনরায় চলে আসে প্রাণীর নাকে। এইভাবে অদৃশ্যমান জগতে প্রাণীর প্রশ্বাস গাছের ও গাছের প্রশ্বাস জীবের দেহে যে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে যার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হলে পৃথিবীর প্রাণীকুল মরে নিঃশেষ হয়ে যেত। এ সব ব্যবস্থাপনা কি আপনা আপনিই হতে পারে?

২৩ নং যুক্তি ঃ

হার্ট ও শিরা উপশিরার কার্যকলাপ

প্রাণীর দেহে হার্টের কাজ হলো প্রতিমিনিটে কমপক্ষে ৭০/৭২ বার দেহের সর্বত্র বিশুদ্ধ রক্ত সাপ্লাই দেয়া ও সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্বত্র হতে রক্তের দূষিত অংশকে রক্ত শোধনাগারে এনে পৌছে দেয়া ও তা সংশোধন করে সঙ্গেসঙ্গে দেহের সর্বত্র পুনরায় পাঠিয়ে দেয়া। যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে হাজারও প্রকার যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল কার্যকর রয়েছে।

এসব ব্যাপারগুলি বুঝানোর জন্যে আল্লাহ সংক্ষেপে বলেছেন خَلَقَ فَسَوّٰى "তিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন।" অর্থাৎ তিনি আসমান, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রসহ যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করে যাকে যেখানে রাখলে এবং যাকে যে ধরনের আকর্ষণ শক্তি দিলে ও গ্রহ-নক্ষত্রের একটা থেকে অপরটাকে যত দূরত্বে রাখলে তা টিকতে পারবে সেই ভাবে হিসাব নিকাশ করে সবকিছুকে তিনি সুবিন্যস্ত করেছেন। তাছাড়া মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকেও সৃষ্টি করে তা একটার সঙ্গে অপরটাকে সেট করা হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিক পন্থায়। যেমন হাতের জায়গায় হাত, পায়ের জায়গায় পা, এভাবে চোখ কান, নাক, মুখ, হাত পায়ের গিরা, আঙ্গুলের ছোট ছোট অংশগুলির সংযোজন দেহের অভ্যন্তরের সব কিছু বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেট করা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কি আপনা আপনি হতে পারে? কস্মিন কালেও তা হতে পারে না।

www.draminlibrary.com

২৪নং যুক্তি ঃ

স্বপ্ন

মানুষ এমন বহু স্বপ্ন দেখে যার মধ্যে এমন কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা ভবিষ্যতে ঘটবে। আর তা ঘটেও থাকে। এ ধরনের স্বপ্নের সঙ্গে আপনিও যেমন পরিচিত আমিও তেমন পরিচিত। আল্লাহকে বাদ দিলে এসব স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা দেয়া যাবে কি?

আমার জীবনে এমন বেশ কিছু স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ হয়ত আপনিও দেখেছেন ভবিষ্যতে যার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে এ সব স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা দেয়া যাবে? আমি আমার জীবনের মাত্র একটা উল্লেখযোগ্য স্বপ্নের কথা বলব যা দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর পরেও ভুলিনি। তখন পাড়া গাঁয়ে আলেম মৌলভীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। দেশে কি একটা রোগ যেন মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। তখন এক প্রবীণ মওলানা সাহেব পরামর্শ দিলেন খতমে খাজেগান পড়াতে। শুরু হল খতম পড়ার মত লোক দাওয়াত দেয়া। আমি তখন একেবারে নীচের ক্লাসের মাদ্রাসার ছাত্র। আমি খতম পড়ায় অংশ নিতে পারব মনে করে আমাকে দাওয়াত দিয়েছে কিন্তু এর পূর্বে আমি কখনও খতমে খাজেগান নামে কোন খতমের নামও শুনিনি আর তা কিভাবে পড়তে হয় তারও কিছু জানি না। দাওয়াত পেয়ে দ্বিধা ও সংকোচে ভুগতে লাগলাম। মাদ্রাসার ছাত্র হয়ে কিভাবে বলি যে আমি খতমে খাজেগান পড়তে জানিনা, ওদিকে না জেনে যে উপস্থিত মজলিসে বোকা বনে যাবো। দাওয়াতের নির্দ্ধারিত দিনের পূর্বের রাত্রে স্বপ্নে দেখছি একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি খতমে খাজেগান পড়তে ভয় পাচ্ছ কেন? যা পড়তে হয় তা বলে দেই তুমি মুখস্থ করে ফেল। অতঃপর লোকটি স্বপ্নে বলতে রইলেন আর আমি মুখস্থ করতে রইলাম। প্রায়ই মুখস্ত হয়ে গেল। এরপর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল কথাগুলি মনে রইল। ভাবলাম দেখা যাক কি হয়। দেখলাম খতম পড়তে গিয়ে আমার সেই স্বপ্নে শেখা দোয়া কালামই মওলানা সাহেব পড়তে বলছেন। আমি অন্যের কথা বাদ দিয়ে নিজের কথাই ভাবি যে আল্লাহকে বাদ দিলে এ স্বপ্নের আমিই কি ব্যাখ্যা দিতে পারি? আমি বিশ্বাস করি এরূপ সত্য স্বপ্নের সঙ্গে আপনাদের অনেকেই পরিচিত। এমন

www.draminlibrary.com

অনেক নযীর আছে যে কেউ রাত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছেন তারপর দিনই কিংবা দু-চার দিনের মধ্যেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে। এসবকি আল্লাহর কুদরত ছাড়া সম্ভব হতে পারে?

২৫ নং যুক্তি ঃ

গাছের মধ্যে আল্লাহর তৈরি কারখানা

দেখুন একই স্থানে একই মাটি থেকে একই রস বা খাদ্য সংগ্রহ করে দু'টি গাছ বেড়ে উঠেছে যার একটি নিমগাছ অপরটি খেজুর গাছ। দেখুন ঐ একই মাটির রস নিম গাছের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছের ভিতরকার আল্লাহর কারখানায় গিয়ে তা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত তিক্ত, আর সেই একই রস খেজুর গাছের মাথায় বসান আল্লাহর কারখানায় ঢুকেই হয়ে পড়েছে অত্যন্ত মিষ্টি। এই ধরনের প্রত্যেকটি গাছের মধ্যেই আল্লাহ এমন সব কারখানা করে রেখে দিয়েছেন যেখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট খাদ্য তৈরি হয়ে আসছে। দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানী কি মাটি থেকে রস নিয়ে তা দিয়ে একটা যে কোন ফল তৈরি করে দিতে পারবে? তা কস্মিন কালেও পারবে না। যদি তা কেউ পারে তবে সেই দিন যেন বলে যে, এখন আর আল্লাহকে বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই। (নাউজুবিল্লাহ) এই কথাই আল্লাহ বলেছেন–

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا *
وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ *
(عَبَسَ- ٢٧-٣٢)

অতঃপর আমি যমীনে গাছ উৎপাদন করি যার মধ্যে রয়েছে ফসল, তরি-তরকারি, আঙ্গুর, মূলা, শালগম, তৈলবীজ, খেজুর বিভিন্ন প্রকার ঘন গাছ-পালা, বহু প্রকার ফল-ফলাদি এবং ঘন ঘাস যা হবে তোমাদের জন্য (مَتَاعٌ) সম্পদ। ঘরের আসবাবপত্র ও বহু প্রকার উপকারী জিনিসপত্র এবং খাদ্য لَكُمْ তোমাদের জন্য ও وَلِأَنْعَامِكُمْ তোমাদের গৃহপালিত পশুদের

www.draminlibrary.com

জন্য। অর্থাৎ আমরা খাই ধান থেকে চাউল আর গরুতে খায় ধানের খড়। ঠিক তদ্রূপ আমরা খাই ডাল আর আমাদের গৃহপালিত পশুগুলি খায় ডালের ভূষি। এসব কি মহা বিজ্ঞানী আল্লাহর বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা ছাড়া হতে পারে? কোন বদ্ধ পাগলও বলবে না যে হতে পারে।

২৬নং যুক্তি ঃ

গাছে সম্পদ

আল্লাহ বলেছেন গাছের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে مَتَاعٌ বা লাভজনক সম্পদ। এবার দেখা যাক কি লাভজনক সম্পদ গাছে রয়েছে দেখুন আমরা গাছ থেকে যা পাই তার মাত্র কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করছি। যথা ঃ-

১। তুলা, যা থেকে তৈরি হয় জামা-কাপড়, লেপ-তোশক, কাঁথা-বালিশ ইত্যাদি অনেক কিছু।

২। রস, গুড়, চিনি-মিছরী ইত্যাদি।

৩। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারী, খাট, পালঙ্ক ও হাজারও প্রকার ঘরের আসবাবপত্র।

৪। জলযান ও স্থলযান অর্থাৎ নৌকা, গাড়ি, রিক্সা, গরুর গাড়ি ইত্যাদি ধরনের অনেক কিছু।

৫। উন্নত মানের যানবাহনের বডি।

৬। বিভিন্ন প্রকার ঔষধ।

৭। দা, খন্তা, কুড়াল, কোদাল ও রাইফেল বন্দুকের বাট।

৮। রেশমী সূতা ও রাবার।

৯। চা, কফি।

১০। কাগজ, পিচবোর্ড ইত্যাদি।

এ ছাড়া কত হাজারও প্রকার মূল্যবান সম্পদ আমরা গাছ থেকে পেয়ে থাকি। এসব ছাড়াও গাছের পাতার মধ্যে রয়েছে ফ্রেশ অক্সিজেন তৈরির কারখানা। যেখান থেকে প্রতিনিয়ত পাচ্ছি ফ্রেশ অক্সিজেন। এসব কি কোন ব্যবস্থাপক ছাড়া আপনা থেকে হতে পারে? তা অবশ্যই হতে পারে না।

www.draminlibrary.com

২৭ নং যুক্তি ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ

আল্লাহ বলেন– خَلَقَ لَكُمْ তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا যা কিছু সম্পদ যমীনের মধ্যে রয়েছে তা সবই অর্থাৎ আমাদের উপকারার্থে মাটির গভীরে সৃষ্টি করে রেখেছেন বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ, কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস ইত্যাদি ধরনের কত কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ যা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। তা কি আপছে সৃষ্টি হয়ে থাকা সম্ভব? তা কোন কালেও সম্ভব নয়।

২৮ নং যুক্তি ঃ

বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন গুণাগুণ

দেখুন প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যেই আল্লাহ গুণ বা শক্তি দান করেছেন আর মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন وَالْحِكْمَةَ বুদ্ধিমত্তা যার ফলে মানুষ হিকমতের সাহায্যে দ্রব্যের গুণাগুণ আবিষ্কার করে তার থেকে তৈরি করেছে কত হাজারও প্রকার জিনিসপত্র যেমন ঔষধ, কলকারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, দ্রুতগামী যানবাহন, উড়োজাহাজ, রকেট, স্পুটনিক– বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি ধরনের কত লক্ষ কোটি প্রকার যন্ত্রপাতি যা মানব জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দিয়েছে। এসব কি কোন এক্সিডেন্টের ফল? কোন মাতালও তা বলবে না।

২৯ নং যুক্তি ঃ

পানি ও মাটির মিত্রতা

দেখুন, নিরস শুকনো মাটির সঙ্গে পানি মিশ্রিত হয়ে মাটিকে করে তোলে উর্বর। আর সেই মাটিতে শিকড় গেড়ে মাটি থেকে রস চুষে জন্মাচ্ছে ও বেড়ে উঠছে কত কোটি কোটি কিসিমের গাছপালা। আবার দেখুন সেই পানির সঙ্গে মাটি মিশিয়ে কাদা তৈরি করে সে কাদায় গড়ছে ইট,

www.draminlibrary.com

মেটে হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি ধরনের কত কিছু। ইট থেকে তৈরি হচ্ছে বড় দালান-কোঠা এবং তা থেকে বড় বড় শহর বন্দর গড়ে উঠছে।

পানির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পানি আঠাল কিছুকে ধুয়ে মুছে সাফ করে, ময়লা পরিষ্কার করে সেই পানিতেই এত কঠিন আঠাল জিনিস রয়েছে যা মাটির সঙ্গে মিশে মাটির কণাগুলিকে এমন ভাবে যুক্ত করে দেয় যা পরে শক্তি প্রয়োগ করেও বিচ্ছিন্ন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এসব কি আপনা আপনি হতে পারে?

৩০ নং যুক্তি ঃ

সম্পদ বন্টনে আল্লাহর বিধান

লক্ষ্য করলে প্রত্যেকটি মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়বে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা একটা যুক্তি সঙ্গত নীতি মুতাবিক রয়েছে। যে দেশকে আল্লাহ কৃষি সম্পদে ভরপুর করেছেন তাদেরকে খনিজ সম্পদ দিয়েছেন খুব কম, আবার যে সব দেশকে খনিজ সম্পদের মাধ্যমে বলিষ্ঠ করেছেন তাদেরকে কৃষি সম্পদের ক্ষেত্রে করেছেন দুর্বল। এ ভাবে তার প্রাকৃতিক সম্পদ এমন ভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন যেন কোন দেশ প্রত্যেকটি ব্যাপারে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হতে পারে এবং কোন দেশ যেন প্রত্যেকটি ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভরশীলও না হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ বলেন, وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ এবং তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। যার ফলে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের লোকই তাদের জীবিকা নির্বাহে সক্ষম। এসব কি কোন সুক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন মহা পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা ছাড়াই সম্ভব? তা কোন দিনও সম্ভব নয়।

৩১ নং যুক্তি ঃ

পশুর মধ্যে খাদ্য বস্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার উপকারিতা

আল্লাহ বলেন—

وَلْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ *

(النحل-٥)

www.draminlibrary.com

"এবং তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শীতবস্ত্র, বহু প্রকার উপকারিতা এবং এমন কিছু যা তোমরা খেয়ে থাক।"

—আন-নাহালঃ ৫

এই আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ বলছেন, "তোমরা পশুদের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে সকালে বের হও বিকালে ফিরে আস, এভাবে বিভিন্ন শহরে ব্যবসা বাণিজ্য কর। আমরা দেখি সত্যই পশুর পশম দিয়ে গরম কাপড় বা বস্ত্র তৈরি হয় যার গুরুত্ব আমরা ও আরবের মরুভূমির লোক টের না পেলেও যারা উত্তর বা দক্ষিণমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসী তারা ভালই টের পায় যে, পশুর পশম থেকে শীতবস্ত্রের উপকারিতা কত বেশি। তাছাড়া 'মানাফীয়ু' শব্দ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উপকারিতার কথা বলা হয়েছে তা যে কি তা চিন্তা করলে প্রত্যেকের মগজেই ধরা পড়বে। তা হল পশুর মল মূত্রে সার, চামড়ার জুতা ব্যাগ আরও কত প্রকার ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য, হাড় থেকে সার ইত্যাদি বহু কিছু আমরা পশু থেকে পাই।

৩২ নং যুক্তি ঃ

পশুর পেটে দুধের কারখানা

আল্লাহ বলেন–

نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ* (النحل- ٦٦)

"আমি এমন কিছু তোমাদের পান করাই যা তৈরি হয় পশুর পেটে তার মলমূত্র ও রক্তের ভিতরকার কারখানা থেকে। যা পানকারীদের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য।" —আন-নাহাল ঃ ৬৬।

এখানে আল্লাহ বলছেন, পশুর মলমূত্র ও রক্তের মধ্যখান থেকে তৈরি হয় খালেস দুধ। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে পশু যা খায় তারই একাংশ মলমূত্রে পরিণত হয় আর একাংশ থেকে বেরিয়ে আসে দুধের যাবতীয় উপাদান এবং তা থেকে কত সুন্দর ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে তৈরি হচ্ছে দুধ যা স্তন বা বাট থেকে বেরিয়ে আসছে এক বৈজ্ঞানিক পন্থায়– যার মুখ সর্বদাই নীচু মুখী কিন্তু তা ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে যায় না। তা পানকারীরা দোহন করে বের করে। এটাও কি কোন দৈব দুর্ঘটনার ফলে হতে পারে?

www.draminlibrary.com

৩৩ নং যুক্তি ঃ

মৌমাছির পেটে মধুর কারখানা

আল্লাহ মধু সম্পর্কে বলেন—

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ * ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاۤءٌ لِّلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ * (النحل - ٦٨-٦٩)

"এবং তোমাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন মৌমাছির প্রতি যে, তোমরা পাহাড় পর্বতে ও গাছের ডালে এবং উচ্চ শিখরে মৌচাক তৈয়ার কর। অতঃপর সব ধরনের ফলও ফুলের রস ভক্ষণ কর। অতপর আল্লাহর চিরন্তন শাশ্বত পথগুলি অতিক্রম কর। এরপরই মৌমাছির পেট থেকে নানা রং-এর মধু বেরিয়ে আসে। যার মধ্যে মানব জাতির জন্যে রয়েছে রোগ নিরাময়ের উপাদান। এসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে অবশ্য চিন্তাশীলদের বুঝার মত বহু কিছু নিদর্শন রয়েছে।" —আন-নাহাল ঃ ৬৮-৬৯

চিন্তাশীলদের চিন্তায় এটা সহজেই ধরা পড়বে যে, মানুষের তৈরি কারখানায় কত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে কোন কিছু তৈরি করতে হয়। তাও অনেক সময় ফেল করে কিংবা ফ্রেশ মাল পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্লাহর তৈরি কারখানায় একটি নয়া পয়সাও খরচ নেই, তা কোন দিন ফেলও করে না এবং তাতে কোন ভেজাল মালও তৈরি হয় না, তা হয় সম্পূর্ণ খাঁটি মাল। চিন্তা করুন মৌমাছির দ্বারা আল্লাহ যে কাজ করান তা কি মানুষ পারবে করতে? পারবে কি হাজারও চেষ্টা করে একটা মৌচাক তৈরি করতে? এবং পারবে কি ফুলের রস থেকে ফ্রেস মুধ তৈরি করতে যেমন আল্লাহ করেছেন? আর সে মধুর মধ্যে আল্লাহ রেখেছেন সর্বরোগের ঔষধ যা পরীক্ষিত সত্য। এটা কি করে সম্ভব? এর জবাব আল্লাহকে অস্বীকার করে দেয়া যাবে কি? তা কক্ষনো যাবে না।

www.draminlibrary.com

৩৪ নং যুক্তি ঃ

গাছ থেকে জীবের খাদ্য ও জীব থেকে গাছের খাদ্য

আল্লাহর কি আশ্চর্য ব্যবস্থাপনা! জীব খেয়ে যে মলমূত্র ত্যাগ করে তার মধ্যে রয়েছে গাছের খাদ্য; আর গাছ যে ফল দেয় তা হয় মানুষের খাদ্য। মানুষ নিঃশ্বাস নিয়ে যে বায়ুকে দূষিত আকারে ছেড়ে দেয় গাছ তা নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করে ও পরে তা বিশুদ্ধ করে জীবের নিঃশ্বাস উপযোগী করে ছেড়ে দেয়। আবার জীব তা নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করে। এই ভাবেই গাছের সহায়তায় জীব ও জীবের সহায়তায় গাছ বেঁচে থাকে। তাছাড়া আরও লক্ষ্যণীয় যে মানুষকে আল্লাহ হিকমত দিয়েছেন। তাদের খাদ্য যে সব গাছের মাধ্যমে আসে তা কষ্ট করে ও বহু চেষ্টা-সাধনা করে জন্মাতে হয় যেমন বিভিন্ন দামী ফলের গাছ। কিন্তু পশুর খাদ্য যে ঘাস তা ধানের মত করে ফলাতে হয় না, কারণ পশুকে আল্লাহ হিকমত দেননি। এসব ব্যবস্থাপনাও কি এক্সিডেন্টের ফল?

৩৫নং যুক্তি ঃ

বিভিন্ন প্রকার গাছের টিকে থাকার ব্যবস্থা

দেখুনগুড়ি ওয়ালা গাছগুলি শক্ত মজবুত শিকড় এঁটে দিয়ে মাটির উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন ছোট খাট ধাক্কায় ও বাতাসের ঝাপটায় উপড়ে না যায়। পক্ষান্তরে যেগুলি লতা জাতীয় গাছ— ঝড়ের ঝাপটা সইতে পারে না— তাদেরকে আল্লাহ এমন শক্তি দিয়েছেন যে, কোন কোন লতা গাছ বেয়ে উপরে ওঠে ও নরম অগ্রভাগটা বৃত্তাকারে ঘুরাতে ঘুরাতে লম্বা হয়, যখনই কোন শক্ত কিছুর সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যায় তখন তাকে পেঁচানো শুরু করে, এই ভাবে পেঁচাতে পেঁচাতে উপরে ওঠে যেন মোটা শক্ত কিছুকে অবলম্বন করে তারা টিকতে পারে। আর কিছু লতা গাছ আছে যাদের পাতার বোঁটার গোড়া দিয়ে সরু তার বের হয় এবং তারগুলি ক্রমে ক্রমে লম্বা হয় ও বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠে। যখনই কোন কিছুর সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যায় তখনই ঐ তার দ্বারা তাকে পেঁচাতে শুরু করে। এইভাবে লতা গাছগুলি বাঁচার একটা অবলম্বন করে নেয়। এর পিছনে কি কোন ব্যবস্থাপক নেই?

www.draminlibrary.com

৩৬ নং যুক্তি ঃ

ছোট প্রাণীর বাঁচার ও টিকে থাকার ব্যবস্থা

দেখুন ছোট এবং সর্বাপেক্ষা অসহায় প্রাণী উই পোকাকে আল্লাহ চোখ দেননি অথচ এমন হিকমত দান করেছেন যে তাদের মত করে অত সুন্দর কায়দায় কোন জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ারও একটা ঘর তৈরি করতে পারবে না। আর যেহেতু তারা দেখে শুনে খেতে পারে না তাই তাদের খাদ্য করেছেন আল্লাহ শক্ত কাঠ। তাদের দেহ সর্বাধিক নরম হওয়া সত্ত্বেও তাদের খাদ্য সর্বাধিক শক্ত। আর যাদের জন্ম যেখানে যে পরিবেশে, আল্লাহ তাকেই সেখানে সেই পরিবেশে বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। আপনি কোন মিষ্টি দ্রব্য আপনার বাড়ির যে কোন লোকের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে রাখতে পারবেন কিন্তু পারবেন কি তা পিঁপড়ার নাক এড়িয়ে লুকিয়ে রাখতে? এসব কি এমনিতেই হয়?

আমরা চিন্তা করলে আরও দেখতে পাব আল্লাহ যত প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি প্রাণীর বেঁচে থাকার ব্যবস্থাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। যেমন দেখুন, পানিতে যে মাছ বাস করে সে মাছের বাঁচার ব্যবস্থা কেমন সুনিপুন অবস্থায় সৃষ্টি করে রেখেছেন। যারা যেখানে বাস করে সেখানেই তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। পানির মাছ পানির মধ্যেই তাদের খাদ্য পায় এবং আল্লাহ তাদের জন্যে সেই সব খাদ্যই নির্ধারিত করেছেন যা পানিতে পাওয়া যাবে– অর্থাৎ পানিতেই তাদের খাদ্য দেয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। আমরা নাকের সাহায্যে বায়ু থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি মাছেরা তাদের ফুলকা বা কানফোর সাহায্যে পানি থেকে সেই অক্সিজেনই গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। মাছের কানের কাছে যে ফুলকা থাকে যাকে মাছের ফলশাও বলে তাতে যে ঝাঝরার মত থাকে ঐগুলিতে এমন শক্তি রয়েছে যে শক্তি পানি থেকে অক্সিজেন নিতে সক্ষম।

এছাড়া দেখুন আমরা পৌষ মাসে ৩০ মিনিট পানিতে থাকলে সর্দি লেগে যাবে কিংবা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা হবে। অথচ সেই ঠাণ্ডা পানিতেই পানির প্রাণীরা গোটা শীতের মৌসুম ধরে বাস করে কিন্তু তাদের কিছুই হয় না। কেন হয় না? এসব কি কোন নিয়ন্ত্রক ছাড়া হতে পারে?

www.draminlibrary.com

এছাড়া আরও কত প্রাণী যে কত জায়গায় আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন আমরা কতটুকু তার খবর রাখি। এমনও প্রাণী আছে যাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না, তাদেরও বাঁচার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। তাছাড়া দেখুন আত্মরক্ষার জন্যে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা কত বিজ্ঞোচিত। কুনো ব্যাঙ, যেগুলি ঘরে বাস করে তাদের গায়ের রং মাটির রং এর ন্যায় যেন তাদের শত্রুদের চোখে সহজে ধরা না পড়ে। আবার গেছো ব্যাঙ, যেগুলো গাছে বাস করে তাদের গায়ের রং গাছের রং এর ন্যায় যেন হঠাৎ কারও চোখে না পড়ে। ঠিক তেমনই যে সাপ গাছের ডালে ডালে বেড়ায় তাদের রং গাছের পাতার রংএর ন্যায় ঐ একই রংএর। পাখীদের বেলায়ও ঐ একই ব্যবস্থা যেন হঠাৎ করে কারও চোখে ধরা না পড়ে। এছাড়া গরুর শিং, বিড়াল কুকুরের নখর, বাঘ ভাল্লুক সিংহ ইত্যাদি তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র তাদের সঙ্গেই জন্ম লাভ করে এবং তাদের দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েই থাকে। মানুষ যদি জ্ঞানবুদ্ধি বলে অস্ত্র তৈরি করতে না পারত তবে মানুষকেও আল্লাহ প্রাকৃতিক অস্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করতেন কিন্তু যেহেতু মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছেন তাই বুদ্ধির দ্বারা যা তারা তৈরি করে নিতে পারবে তা আল্লাহ দেহের সঙ্গে জুড়ে দেননি।

এভাবে অন্যান্য প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখতে পাব আল্লাহর ব্যবস্থা কত মহাবিজ্ঞোচিত। চোখ নেই উই পোকার, তার ন্যায় ঘর বানানোর কোন যোগ্যতা আছে কি বিজ্ঞানীদের? কোন বিজ্ঞানী পারবে তালের পাতা চিরে বাবুই পাখীর ন্যায় একটা বাসা বানাতে? পারবে কি মানুষ মাকড়সার মত জাল বুনতে? পারবে কি মানুষ টুনটুনি পাখীর ন্যায় ডুমুরের পাতায় বাসা বানাতে? পারবে কি মানুষ পিঁপড়ের ন্যায় তার দেহের ১৬ গুণ বেশি ভারী কোন জিনিসকে দাঁতে কামড়ে তুলে নিয়ে যেতে?

মুরগির বাচ্চাদেরকে মুরগি এক বিশেষ ধরনের আওয়াজের মাধ্যমে যখন বিপদ সংকেত দেয় তখন বাচ্চাগুলি হুড় মুড় করে ঝোপ-ঝাড় কিংবা খড় বিচালির নীচে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। আবার যখনই বিপদমুক্ত সংকেত দেয় তখনই বাচ্চাগুলি বেরিয়ে চলে আসে। এর জন্যে তাদের তো কোন ট্রেনিং দেয়া হয়নি। তবে আত্মরক্ষার এ কৌশল শিখলো কার কাছ থেকে?

www.draminlibrary.com

চিন্তা করলে এরূপ হাজারও ব্যবস্থাপনা মানুষের মাথায় ধরা পড়বে যা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি প্রাণীকুলের প্রতি কত মেহেরবান। এসব বিষয়কে সামনে রেখে চিন্তা করলে কি কোন বদ্ধ পাগলও বলবে যে কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমনিতেই সবকিছু সৃষ্টি হতে পারে?

৩৭ নং যুক্তি ঃ

গাছের প্রজনন

এমন বহু গাছ রয়েছে যাদের ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগরেণু গর্ভকেশর পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্যে এক প্রকার পতঙ্গ আল্লাহ নিয়োগ করে রেখেছেন আর কোন কোন ক্ষেত্রে বায়ুর দ্বারাই আল্লাহ এ কাজ সম্পন্ন করান। যা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা সহজেই বুঝতে পারবেন। এসব কি কোন এক্সিডেন্টের ফল?

৩৮ নং যুক্তি ঃ

মানব সন্তান কেন অসহায়

আল্লাহ বলেন, اِنَّـهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا নিশ্চয়ই তারা (মানুষ) ছিল জালেম ও জাহেল। অন্যত্র আল্লাহ বলেন– خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا মানব জাতিকে খুব দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখা যায়, যে মানবজাতি চাঁদ পর্যন্ত পৌছতে পারে সেই মানবসন্তানেরই এমন একদিন ছিল যে-দিন সে নিজের পায়খানা নিজেই নিজ হাতে তুলে মুখে দিত। এই জন্যই আল্লাহ বলেছেন সে ছিল জালেম ও জাহেল। একটা মুরগির বাচ্চা এমন কিছুই খায় না যা তার জন্যে অখাদ্য। তা ছাড়া ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েই তারা ততটুকু হুঁশিয়ার যতটুকু হুঁশিয়ার পূর্ণ বয়স্ক মুরগীরা। দেখুন তারা একেবারেই বাচ্চা কালে মায়ের মুখের কোন বিপদ সংকেত শুনে সঙ্গে সঙ্গে কোন নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে পড়ে এবং পরে মায়ের মুখ থেকে বিপদ মুক্ত সাইরেন শোনার পর বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোন মানবসন্তানই বাচ্চাকালে এমনতর পারে না। পারে না বলেই আল্লাহ তাদের বলেছেন– جَاهِل বা অজ্ঞ ও ضَعِيْف বা দুর্বল। কিন্তু কেন এদের আল্লাহ ছোটকালে এতদূর জাহেল ও জয়ীফ বা অজ্ঞ

www.draminlibrary.com

ও দুর্বল করে সৃষ্টি করলেন? করলেন এই জন্যে যে মানবসন্তান যখন পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয় স্বজন সহ বহু ব্যক্তির স্নেহ-মমতা ও সাহায্য-সহানুভূতি পেয়ে বড় হতে থাকে তখন তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তার সাহায্য কারীদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব। যা পরবর্তীকালে তাকে একটা সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে তোলে এবং এরই থেকে সৃষ্টি হয় সামাজিক দায়িত্ববোধ। মানবসন্তান যদি ভেড়া-বকরির মত জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের খাদ্য নিজেই খুঁজে নিয়ে খাওয়া শিখত তবে অবশ্যই সে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারতো না। মানবসন্তানকে এভাবে অসহায় করে সৃষ্টি করার পিছনে আল্লাহর যে বিরাট হিকমত রয়েছে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? কেউ তা পারবে না।

এইভাবে চিন্তাভাবনা করলে মানুষ দেখবে এ বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্বের ও তাঁর পরম করুণার নিদর্শন। যা কখনও লিখে বা বলে শেষ করা যাবে না। তাই আল্লাহ যথার্থ বলেছেন–

وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا*

"আল্লাহর দান বা নিয়ামত তোমরা কখনই গুণে শেষ করতে পারবে না।" কাজেই আমাদের দ্বারা তা পারা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়? তবে এখানে যতটুকু বলা হল তা শুধু মাত্র চিন্তার একটা সূত্র বের করে দেয়ার জন্যে। এবার এই সূত্র ধরে আপনি যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন ততই আপনার মগজে আল্লাহর অস্তিত্বের ও তাঁর অপরিসীম মেহেরবানীর বহু কিছুই ধরা পড়বে।

৩৯ নং যুক্তি ঃ

জীবন ধারনের প্রধান উপাদান কোন সম্পদ নয়

দেখুন, জীবন্ত প্রত্যেকটি প্রাণীকে এমনকি গাছ পালাকেও বাঁচতে হলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে– যে জন্য প্রয়োজন বায়ু ও বায়ুতে পরিমিত পরিমাণ সেই সব গ্যাসীয় পদার্থ থাকা যা প্রাণীর বাঁচার জন্য প্রয়োজন। আর নিঃশ্বাস যেহেতু সর্বক্ষণই প্রয়োজন তাই এর উপাদানসমূহ আল্লাহ এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন যে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তা

www.draminlibrary.com

কাউকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। যদি তা পয়সা দিয়ে কিনতে হত তাহলে কোন প্রাণীরই আজ কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। তদ্রূপ পানিও জীবন ধারনের জন্যে এমন প্রয়োজনীয় যে, পানি ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না? শুধু যে বাঁচতে পারে না তাই নয় বরং কোন প্রাণী পানি ছাড়া অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না সে পানিও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু বায়ুর তুলনায় পানির প্রয়োজন যে পরিমাণে কম বায়ুর তুলনায় পানির পরিমাণও ঠিক সেই একই হারে কম। কাজেই পানি কোন কোন এলাকার সম্পদ অর্থাৎ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। কিন্তু তা এমন নয় যা সেই এলাকার অধিবাসীদের জন্য দুর্লভ। এ ছাড়াও লক্ষ্যণীয় যে, নিঃশ্বাস লওয়ার জন্য কোন ঐচ্ছিক চেষ্টার প্রয়োজন নেই। ওটা সারা জীবনই জ্ঞানের অগোচরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস যাচ্ছেই এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ সেরে সে বেরিয়ে আসছেই। এটাও কি বিনা পরিকল্পনায় হতে পারে? তা অবশ্যই পারে না।

৪০ নং যুক্তি ঃ

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই আল্লাহ বিশ্বাসের অনুকুলে

দেখুন আল্লাহ যেমন মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন তেমন তার বিবেককে আল্লাহ বিশ্বাসের অনুকূল স্বভাবের করে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন সে যে কোন বড় নাস্তিকই হোক না কেন সে যখনই কোন বড় ধরনের বিপদে পড়ে তখন তার জ্ঞানের অগোচরেই সে আল্লাহকে স্মরণ করা শুরু করে। এবং এটাও প্রমাণিত সত্য যে পৃথিবীব বড় বড় নাস্তিকদেরও মৃত্যুর পর তাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া তাদের জন্মগত ধর্মীয় বিধান মুতাবিকই সম্পন্ন করা হয়েছে, যেমন ডারউইন, কার্লমার্কস, লেনিন এরা যেহেতু জন্মগতভাবে ইহুদি ছিলেন তাই ইহুদি ধর্মের নিয়ম মুতাবিক তাদের সমাধিস্থ করা হয়েছে। আর মাও সেতুং যেহেতু জাতে বৌদ্ধ ছিলেন তাই তার শেষ অন্তেষ্টিক্রিয়া বৌদ্ধধর্মের নিয়ম মুতাবিকই সম্পন্ন হয়েছিল।

এছাড়াও দেখা যায় যা-ই আল্লাহর বিধান তা-ই মনেরও বিধান। যেমন আল্লাহ বলেছেন সত্য কথা বলতে তাই মনকেও আল্লাহ করেছেন সত্য বলারই অনুকূলে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান মেনে চলাই মানুষের সহজাত

www.draminlibrary.com

প্রবৃত্তি। মানুষ শুধু মাত্র লোভ-লালসার বশবর্তী হয়েই আল্লাহর বিধান অমান্য করে। যেমন, ছোট্ট শিশুরা-যারা এখনও লোভ বোঝে না তারা কখনই মিথ্যা বলবে না এবং যারা বদ্ধ পাগল তারাও মিথ্যা বলবে না কারণ তাদের লোভ লালসার অনুভূতি থাকেনা। আল্লাহ যেহেতু সত্য বলাই পছন্দ করেন তাই তিনি মানুষের প্রবৃত্তিকে সত্যবাদী স্বভাবের করেই সৃষ্টি করেছেন। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় আল্লাহ মানুষের মনকে আল্লাহ ও আল্লাহর বিধান মানার উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন যাকে বলতে হবে আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত সৃষ্টি।

৪১নং যুক্তি ঃ

আল্লাহর সুক্ষ্ম হিসাব

সম্প্রতি বাংলাদেশের বাজারে "সত্যের সন্ধান" নামে একখানা বই উঠেছে। তাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে অংক না জানার অভিযোগ করা হয়েছে। এখানে সে অভিযোগের একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হল ঃ

যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি ফারায়েজের একটা অংকের কথা তুলে ধরেছেন। সূরা নিসার ১১নং আয়াতের এক অংশে বলা হয়েছে যদি কারও মৃত্যুর পর ২ মেয়ে থাকে আর মা ও বাবা থাকে তাহলে পিতা মাতা উভয়ে পাবেন $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{২}{৬}$ বা $\frac{১}{৩}$ অংশ আর ২ মেয়ে পাবে $\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{২}{৩}$ অংশ। এভাবে $\frac{১}{৩}+\frac{২}{৩}=$ ১ অর্থাৎ পুরা অংশ। কিন্তু যদি তার স্ত্রী থাকে তবে সে স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ। এই $\frac{১}{৮}$ অংশ সে পাবে কোথা থেকে? এই প্রশ্ন তুলে তিনি মন্তব্য করেছেন আল্লাহ কি তাহলে অংকে অনভিজ্ঞ। তাঁর মন্তব্যে মনে হয় যেন তিনি আল্লাহর একটা অংকের ভুল ধরে দিয়ে মনে মনে খুবই উৎফুল্ল। এখানে ফারায়েজের ব্যাপারটা একটু পরে বলে তার পূর্বে খানিকটা যাচাই করে দেখি যে আল্লাহ কি বিংশ শতাব্দীর উচ্চতর অংকের যুগের কিছু কিছু অংকে সত্যিই অনভিজ্ঞ কি না। আর এটাও দেখি যে তিনি কি কি অংক জানেন। অনেকে বলেন সাধারণের কথার জবাব দেয়া ঠিক না। এতে আমিও একমত তবে যে সব কথায় কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং জাহান্নামের রাস্তায় ওঠে তাদেরকে ফেরানোর জন্য কিছু কথা বলা উচিৎ মনে করে নিম্নে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করছিঃ

www.draminlibrary.com

আল্লাহর জানা অংকগুলোর কিছু ঃ

আসমান যমীন কিছুই যখন সৃষ্টি হয়নি, এবং যখন তিনি সৃষ্টিতে হাত দিলেন তখন প্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হল وَهِيَ دُخَانٌ (সূরা হামীম আস-সাজদা, আয়াত ঃ ১১) তা ছিল (বাষ্পীয়) ধোঁয়ার পিন্ডলি। এরপর আল্লাহ হুকুম করলেন- فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهًا ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আসমান যমীন অস্তিত্ব ধারণ কর। আসমান যমীনের পক্ষ থেকে জবাব এল قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব ধারণ করলাম।

এর থেকে কয়েকটা জিনিস বুঝা গেল, যথা ঃ

১। সেই ধোঁয়ার পিণ্ডলিটা কত বড় বা কি আয়তনের হওয়ার প্রয়োজন ছিল সে হিসাব তাঁর নির্ভুল ভাবে জানা ছিল।

২। আসমান এবং যমীনের কোনটার আয়তন কতটুকু হওয়া উচিৎ এবং একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব কতটুকু হতে হবে সে হিসাব আল্লাহর সঠিক ভাবেই জানা ছিল।

৩। কেন এক মূল বস্তু থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন এ হিসাবও তার নির্ভুল ভাবে জানা ছিল।

৪। সাত আকাশকে কত দূরে দূরে রাখলে বিজ্ঞান সম্মত হবে সে অংকও আল্লাহ নির্ভুল ভাবে জানতেন।

৫। কতগুলো নক্ষত্র নামের সূর্য থাকতে হবে, কতগুলো গ্রহ থাকতে হবে, কোন্ গ্রহের কতগুলি উপগ্রহ থাকতে হবে, তার কোনটার দূরত্ব কোনটা থেকে কত দূরে হতে হবে যেন কোনটার সঙ্গে কোনটার টক্কর না লাগে, সে অংক আল্লাহর অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে জানা আছে।

৬। একটা নক্ষত্র থেকে অন্য আরেকটা নক্ষত্রের দূরত্ব কতটা হতে হবে এবং কোনটার আয়তন কতটা হতে হবে সে হিসাবে আল্লাহর বিন্দু মাত্রও গরমিল নেই।

www.draminlibrary.com

৭। প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্র মহা ফাঁকায় গতিশীল অবস্থায় রয়েছে এবং রয়েছে সুনির্দিষ্ট গতিবেগ আর রয়েছে মহাফাঁকার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্র, চাঁদ সূর্য্য ইত্যাদি প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট চলার পথ। আপন আপন পথ থেকে এদের কোনটি যদি এক বিন্দু পরিমাণও সরে যেত তাহলে একটার সঙ্গে অন্যটার টক্কর লেগে কবে এ সৃষ্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। এ সবের যদি হিসাব মানুষের তৈরি স্কাইল্যাবের মত হত তাহলে উপায়টা কি হত? অথচ কোটি কোটি বছরের মধ্যে ঘটল না এর কোন ব্যতিক্রম। এ হিসাব যিনি জানেন তিনিই কি অংকে অনভিজ্ঞ?

৮। পৃথিবী সূর্যের চারি পার্শ্বের প্রায় ৬২ কোটি মাইলের বৃত্তাকার পথ ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় যে একবার ঘুরে আসে, এ পথের মাপ ও চলার গতির মধ্যে রয়েছে এমন নিখুঁত হিসাব যে তার মধ্যে কোন প্রকার সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটলে কমপক্ষে ৩টি বিপর্যয়ের যে কোন একটি ঘটত।

(১) পৃথিবীর সঙ্গে অন্য যে কোন গ্রহের টক্কর লাগতো। নইলে

(২) পৃথিবী কবে সূর্যের মধ্যে ঢুকে পড়ত। কিংবা

(৩) পৃথিবী সূর্য থেকে এত দূরে সরে যেত যে সূর্যকে একটা নক্ষত্রের ন্যায় দেখা যেত। ফলে পৃথিবী তাপ হারিয়ে বরফের একটি পিণ্ডলিতে পরিণত হত। তাতে একটি প্রাণীও বাঁচতে পারত না। অর্থাৎ কলের গানের রেকর্ড যেমন কেন্দ্রের চারপাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয় ঠিক তেমনই পৃথিবী যদি ঘুরতে ঘুরতে এক বিন্দু করে কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে এগোত তাহলে এতদিনে হয়ত পৃথিবী সূর্যের মধ্যে ঢুকে পড়ত। আর যদি পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে এক বিন্দু করে দূরে সরে যেত তাহলে পৃথিবী কবে বরফে ঢাকা পড়ে যেত। কিন্তু কৈ তা তো হচ্ছে না? এই জন্যেই তো আল্লাহ বলেছেন—

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ * (يٰسٓ - ٣٨)

এসব কিছু নির্ধারণ করেছেন তিনি যিনি মহা শক্তিধর ও মহাজ্ঞানী। আর এ হিসাবে কোন ব্যতিক্রম হবেনা বলেই তিনি বলেছেন—

www.draminlibrary.com

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا * (فَاطِر- ٤٣)

তোমরা কখনই আল্লাহর সুনির্দ্ধারিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম পাবে না। যা প্রকৃত পক্ষেই আমরা পাচ্ছি না।

৯। মহা ফাঁকার মধ্যে গতিশীল সবকিছুরই একটা সুনির্দ্ধারিত আয়তন আছে এবং কি পরিমাণ আয়তন ও ঘনফল বিশিষ্ট কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রের কোনটার মধ্যে কি পরিমাণ মধ্যাকর্ষণ শক্তি দিলে সে মহা ফাঁকায় নিজের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে সে হিসাবে বিন্দু মাত্রও যদি ব্যতিক্রম কোন দিন ঘটত তাহলে কবে এ সৃষ্টি বিলয় হয়ে যেত। কিন্তু তাতে কোন ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

১০। আল্লাহর এ হিসাবেও কোন গরমিল নেই যে এ পৃথিবীর কোন জিনিসের কি পরিমাণ আয়তনের কোন জিনিসের মধ্যে মধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ কি পরিমাণ হতে হবে অর্থাৎ যে আয়তনের লোহার ওজন একমণ হবে সেই আয়তনের পারদের ওজন কত হতে হবে। আর অন্যান্য ধাতব পদার্থের কোনটা কি পরিমাণ ঘনত্বের কারণে কি পরিমাণ ভারী হতে হবে তার হিসাবে কিছু মাত্র রদ বদল নেই। যদি থাকত তাহলে মধ্যাকর্ষণ কম হলে ট্রেন জোরে চলতে গেলে ছিটকে পড়ে যেত আর যদি আকর্ষণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত তাহলে প্লেনগুলো উড়তে পারত না। তাঁর এসব অংকের হিসাব এত নিখুঁত যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকার কোন ব্যতিক্রম নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ খুব ছোট্ট করে বলেছেন সূর্য ও চাঁদের দূরত্বের একটা হিসাবের কথা। বলেছেন— اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

সূর্য ও চাঁদের জন্যে রয়েছে দুই ধরনের হিসাব। চাঁদকে এমন দূরে রাখা হয়েছে যেন নিয়মিত জোয়ার ভাঁটা হতে পারে। অর্থাৎ চাঁদ যদি আরও নিকটে হতো তাহলে জোয়ারের পানিতে কবে পৃথিবীর প্রাণীকুল শেষ হয়ে যেতো। আর যদি চাঁদ আরও দূরে থাকত তাহলে জোয়ার ভাটা হতেই পারত না। বাংলায় যাকে বলা হয় 'অংক' আরবীতে তাকেই বলে 'হিসাব'। এই 'হিসাব' এর দ্বিবচন হচ্ছে আরবীতে হুসবান। হুসবান বা অংকের কথাই

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ বলছেন 'এ অংক আমার নিখুঁতভাবে জানা আছে এবং সে মুতাবিক চাঁদ ও সূর্যকে পৃথক পৃথক হিসাব অনুযায়ী একটা বিজ্ঞান সম্মত দূরত্বে রাখা হয়েছে। সূর্যের হিসাব হচ্ছে এই যে তার দূরত্ব বছরের সব সময় এক প্রকার নয়। যখন সূর্য বিষুব রেখার উত্তরে থেকে পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সূর্য পৃথিবী থেকে পৌষ মাসের তুলনায় ৩০ লক্ষ মাইল বেশী দূরে থাকে। কারণ সরাসরি সূর্যের কিরণে যে পরিমাণ মাটি যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় সেই পরিমাণ পানি ততশীগ্র উত্তপ্ত হয় না। তাই পৃথিবীর দক্ষিন অঞ্চলের বেশির ভাগ পানির উপর যখন সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন যেহেতু দক্ষিণ অঞ্চলে পানির ভাগ বেশি তাই তখন সূর্য আষাঢ় মাসের তুলনায় ৩০ লক্ষ মাইল নিকটে এসে যায়। এ হিসাব এত সুক্ষ্ম যা হয়ত জনাব আরজ আলি সাহেবের বন্ধু বান্ধবগণ কষে মিলাতে পারবে না।

১১। মানুষের দেহের মধ্যকার যে কোন জিনিসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহর হিসাব কত নিখুঁত। যেমন রক্ত কণিকার মধ্যে কি কি উপাদান কোনটা কত পারসেন্ট থাকলে মানুষের দেহটা সুস্থ থাকবে সে হিসাব আল্লাহর নিখুঁতভাবে জানা আছে এবং তা সেই পরিমাণ শুধু মানুষের দেহেই নয় সব ধরনের প্রাণীর মধ্যেই তা রয়েছে। ঠিক তেমনই, একটা মানুষ মাথা উপর দিকে রেখে চলাফেরা করতে রক্তের সঞ্চালন পদ্ধতিটা কেমন হতে হবে যেন মানুষ মাথায় রক্ত উঠে মরে না যায়, তা হিসাব মতই নিয়ন্ত্রণ করেছেন আল্লাহ। ফলে মাথা উঁচুর দিকে রেখে চলে ফিরে বেড়াতে পারি। কিন্তু পারি না পা উপর দিক দিয়ে হাঁটতে। কেন পারি না? পারি না এই জন্যে যে আল্লাহর সাজানটাই এমন যে মাথা উপরে দিয়ে এবং পা নীচের দিকে রেখেই মানুষ যেন চলতে পারে। এসব হিসাব আল্লাহ ঠিকই জানেন।

১২। আল্লাহ খুবই নিখুঁত হিসাব রাখেন আমরা যা খাই তার প্রতি। কোনটা কোন উপাদানের সংস্পর্শে কিভাবে হযম হবে তার কোন অংশটা শরীরের কোন জায়গার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে কিভাবে মিলিত হবে, কিভাবে দেহের শক্তি যোগাবে আর কোন্ অংশটা প্রস্রাব হবে, কোন অংশটা

www.draminlibrary.com

পায়খানা হবে, কিভাবে দেহের ক্ষয় হবে ও কিভাবে তা পূরণ হবে, এসব হিসাব আল্লাহ নিখুঁত ভাবে জানেন।

তিনি জানেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেনটা দেহের মধ্যে কোথায় যাবে। দেহের কোন অংগ তাকে গ্রহণ করবে এবং তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেহের কোন কোন অংশে পৌছা দরকার এবং তা কেমন ভাবে পৌছাতে হবে। এসব হিসাব আল্লাহ কম জানলে পৃথিবীর প্রাণীকুল কি করে শেষ হয়ে যেত না?

আল্লাহর অংক জানার খবর আমার যেটুকু জানা আছে তার চাইতে অনেক বেশি জানা আছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের। আমার মাথায় যা ধরা পড়ে তা তাদের চাইতে অনেক অনেক কম। তবুও যা আমার জ্ঞানে ধরা পড়ে তা লিখলে বই অনেক বড় হয়ে যাবে। আর এটা এমন যুগ নয় যে মানুষ অল্পে বুঝে না। কাজেই বেশি লেখার প্রয়োজন মনে করি না। সংক্ষেপে উক্ত ফারায়েজের তাৎপর্য নিম্নে দেয়া হলঃ

আমরা মূলনীতিশাস্ত্র বা উসূল থেকেই জানি যে ইসলামের মধ্যে যে কোন বিতর্কিত প্রশ্নের উত্থাপন হলে বা কোন সমস্যা দেখা দিলে আল-কুরআন থেকে তার সমাধান মিলবে। এটা প্রথম দলীল।

আর যদি কুরআন থেকে সুস্পষ্ট কোন সমাধান না পাওয়া যায় তাহলে হাদীস থেকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটা ইসলামের দ্বিতীয় দলীল।

আর তাতেও যদি না পাওয়া যায় তাহলে কুরআন হাদীসের মূলনীতির ভিত্তিতে ওলামায়ে দ্বীনের ইজমা থেকে তার সমাধান নিতে হবে। এটা তৃতীয় দলীল এবং তাতেও যদি সমাধান না হয় তাহলে কুরআন হাদীসের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে কিয়াস করতে হবে। এটা হচ্ছে ইসলামের চতুর্থ দলীল। কিন্তু মূল দলীল হচ্ছে কুরআন।

তাই পরবর্তীগুলি মূল দলিলের বিরোধী হতে পারবে না। এটাই ইসলামের মূলনীতি।

আর এ ধরনের কিছু ব্যাপার আল্লাহ ছেড়ে ছেড়ে গেছেন যেন আমরা মানুষ গবেষণা করার সুযোগ পাই এবং এর মাধ্যমে যেন আমাদের চিন্তা

www.draminlibrary.com

শক্তির বিকাশ ঘটতে পারে। আল্লাহ যে মানুষকে চিন্তা করে সত্য আবিষ্কারের সুযোগ দিয়েছেন সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এ মাসয়ালার সমাধান দিয়েছেন এইরূপ—

পিতা $\frac{১}{৬}$ + মাতা $\frac{১}{৬}$ + ২ মেয়ে $\frac{২}{৩}$ + স্ত্রী $\frac{১}{৮}$

$\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৮}$ = এর লঃ সাঃ গুঃ ২৪

অতএব= $\frac{৪}{২৪} + \frac{৪}{২৪} + \frac{১৬}{২৪} + \frac{৩}{২৪} = \frac{২৭}{২৪}$

অথবা, আরও সহজ করে লিখলে–

পিতা– $\frac{৪}{২৪}$

মাতা– $\frac{৪}{২৪}$

২ মেয়ে– $\frac{১৬}{২৪}$

স্ত্রী– $\frac{৩}{২৪}$

সর্বমোট– $\frac{২৭}{২৪}$

এতে মূল অপেক্ষা $\frac{৩}{২৪}$ বৃদ্ধি হয়ে যায়। এই জন্যে মোট সম্পত্তিকে ২৭ ভাগ করে....

৪	ভাগ	পিতা
৪	"	মাতা
১৬	"	২ মেয়ে
৩	"	স্ত্রী

মোট– ২৭ ভাগ

www.draminlibrary.com

অতএব, মোট ২৭ ভাগ করে এর সমাধান দেয়া হয়েছে। এ ধরনের অবস্থায় নির্দেশই রয়েছে যে, যেখানেই এই ধরনের কোন কিছু ঘটে সেইখানেই–

فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ .

তোমরা ন্যায় বিচার মুতাবিক ফয়সালা করে দাও। এভাবে ন্যায় সঙ্গতভাবে অনেক কিছুরই ফয়সালা করার অধিকার আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। দিয়েছেন বিচারের ক্ষেত্রেও। সেখানে মাত্র ৫টি অপরাধ ছাড়া সব অপরাধের বিচারের স্বাধীনতা বিচারকের রয়েছে। সে পাঁচটি হল ঃ (১) চুরি (২) ডাকাতি (৩) যেনা (৪) যেনার অপবাদ (৫) মদ্য পান। এই কটার শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত আর বাকি অপরাধের শাস্তির বিচার করার অধিকার আল্লাহ বিচারককে দিয়েছেন। এছাড়া ফারায়েজের ব্যাপারে আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে এই যে ওয়ারিস যত বাড়বে তার ভাগ তত কমবে। কাজেই এখানে ওয়ারিস একজন বেড়েছে কাজেই অন্যের ভাগ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে কমেছে।

www.draminlibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামই একমাত্র ধর্ম

ধর্মীয় ব্যাপারে আমার চিন্তাধারা

আমি চিন্তা করি, কারও সামনে কেউ যদি এন্ড্রিনকে ঔষধ মনে করে বাঁচার লোভে পান করতে যায় তবে তাকে সেই এন্ড্রিন পান করা থেকে বিরত রাখা যেমন এন্ড্রিনকে বিষ বলে জানা লোকদের জন্য একটা বিরাট নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই বরং তার চাইতেও অনেক গুণ বেশি দায়িত্ব এসে পড়ে তাদের ওপর যারা স্পষ্টভাবে বুঝেন যে, কিছু লোক ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণে পরকালের মুক্তির আশায় ভুল করে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদেরকে ঐ আগুনের পথ থেকে ফেরানো আল্লাহ-বিশ্বাসীদের জন্য একটা অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব। এটা যে কত বড় দায়িত্ব তা মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতো যদি মৃত্যুর পরের ঘটনাগুলিকে আল্লাহ এই জীবনে দেখার কোন ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু যদিও আল্লাহ চর্মচক্ষে তা দেখার কোন ব্যবস্থা করেননি তবু জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তা দেখার ব্যবস্থা করেছেন। জ্ঞানের চোখ দিয়ে তা কিছু লোক দেখেও থাকেন।

আমি চিন্তা করি, একটা লোককে আগুনে পুড়তে দেখেও যারা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে না তারা যেমন চরম নিষ্ঠুর, নির্দয় ও পাষন্ড ঠিক তেমনই চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় হিসেবে আমি নিজেই আল্লাহর দরবারে চিহ্নিত হবো যদি আমি আমার জ্ঞানচক্ষুতে স্পষ্ট ভাবে কিছু লোককে আগুনের দিকে ছুটে যেতে দেখেও তাদেরকে সেই আগুনের পথ থেকে ফেরানোর জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা না করি। এই অনুভূতিই আমাকে বহুদিন থেকে পীড়া দিচ্ছিল; তাই আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আমার জ্ঞান মুতাবিক কিছু যুক্তি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

www.draminlibrary.com

সব ধর্মই কি ঠিক?

যারাই কোন না কোন ধর্ম মানে তারা প্রত্যেকেই মনে করে ধর্ম আমারটাই ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, একই বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার বিপরীতমুখী দাবীর সবগুলিই কি ঠিক হতে পারে? একই অংকের একাধিক উত্তরের সবগুলিই যেমন ঠিক হতে পারে না, তেমন একই সৃষ্টিকর্তার দেয়া ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার বিপরীতমুখী দাবি বা ধারণার সবগুলিই ঠিক হতে পারে না, এটাই যুক্তি। এখন প্রশ্ন, দাবি কারটা ঠিক এবং কারটা বে-ঠিক? এ প্রশ্নের অবশ্যই সঠিক জবাব আছে তবে তা বুঝতে হলে কমপক্ষে নিচের শর্তগুলি মেনে নিতে হবে। এর জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে মনকে নিরপেক্ষ ও গোঁড়ামী মুক্ত করতে হবে এবং কোন ধর্ম ঠিক তা বুঝতে হলে বুঝার পূর্বে নিজেকে ধরে নিতে হবে যে আমি কোন ধর্মেরই লোক নই। আমার সামনে অনেকগুলি ধর্ম রয়েছে। এগুলি আমি দেখি, সত্য-মিথ্যা যাচাই করি, এরপর যেটা সঠিক বলে আমার জ্ঞানে ধরে সেটাই আমি গ্রহণ করবো। এর জন্য আরও যা প্রয়োজন হবে, তা হচ্ছে ঃ

১. যুক্তি মানতে রাজি থাকতে হবে অর্থাৎ সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলে মানতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২. মানতে হবে ধর্ম কোন পৈত্রিক সম্পদ নয়, এ হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার।

৩. মানতে হবে বিশ্বাসের সম্পর্ক রক্ত বা বংশের সঙ্গে নয়; এর সম্পর্ক সম্পূর্ণই জ্ঞানের সঙ্গে।

৪. মানতে হবে যে, পূর্ব পুরুষের ভুল-বিশ্বাস অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য।

৫. মানতে হবে যে, পিতার ভুল বিশ্বাস যদি পরিবর্তনযোগ্য না-ই হতো, তাহলে জ্ঞানচর্চার কোন মূল্যই থাকতো না।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, আমাদের দেশের অনেকেরই পিতার বিশ্বাস ছিল পৃথিবী একটা গরুর শিং–এর ওপর রয়েছে। সে গরু যখন শিং পরিবর্তন করে তখন ভূমিকম্প হয়। আরও বিশ্বাস ছিল যে, রাহু নামক কোন বিরাট আকারের জন্তু চাঁদকে গ্রাস করতো বলে চন্দ্রগ্রহণ হতো এবং এটাই

www.draminlibrary.com

ছিল চন্দ্রগ্রহণের কারণ। এরপর দেশের ব্রাহ্মণদের সম্মিলিত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাহু চাঁদকে ছেড়ে দিতো। এ ভাবেই চাঁদের অস্তিত্ব টিকে আছে নইলে বহু পূর্বেই চাঁদ রাহুর পেটে হজম হয়ে যেতো।

পিতার এই সব ভুল-বিশ্বাস যদি অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে তাহলে ধর্ম সম্পর্কীয় পিতার ভুল-বিশ্বাস কি পরিবর্তন হতে পারে না? অবশ্যই পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পিতার ভুল-বিশ্বাস ত্যাগ করায় যেমন কারও কোন প্রকার অমর্যাদা হয়নি বরং মর্যাদা বেড়েছে ঠিক তেমনই ধর্ম সম্পর্কীয় পিতার ভুল-বিশ্বাস ত্যাগ করলেও মর্যাদা কমবে না বরং বাড়বে।

এসব কথা যারা মানতে প্রস্তুত তাদেরই চোখে ধরা পড়বে যে, ধর্ম কোনটা ঠিক আর কোনটা বে-ঠিক।

কয়েকটি ব্যাপারে ধর্ম-বিশ্বাসীদের ঐকমত্য

যারাই কোন না কোন ধর্ম মানে তারাই নিম্নে বর্ণিত চারটি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে, যথাঃ

১। সৃষ্টিকর্তা আছেন।

২। পরকাল আছে ও বিচার হবে।

৩। বিচারের পর যার যার কর্মফল সে সে ভোগ করবে। সেদিন অপরাধী শাস্তি ভোগ করবে এবং নিরপরাধ ব্যক্তি মুক্তি পাবে।

৪। পরকালের মুক্তি সবারই কাম্য।

বেশি নয়, এ ৪টি বিষয়ে যখন আমরা প্রত্যেক ধর্মের লোকই একমত, তখন আসুন আমরা যার যার নিজের স্বার্থেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে খুব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি যে, পরকালের মুক্তির সঠিক পথ কোনটি এবং মুক্তির পথ সম্পর্কে কোন ধর্ম কি বলে, আর তার মধ্যে কার কথা কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য? আসুন এগুলো সুস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখি। দেখুন, রোগ-চিকিৎসার বেলায় যেমন ডাক্তার ও ঔষধের প্রতি রোগীকে আস্থাশীল হতে হয়, ঠিক তেমনই পরকালের মুক্তির ব্যাপারেও একটা পন্থার ওপর সম্পূর্ণ নিজেকেই আস্থাশীল হতে হয়। তাই প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির উচিৎ তার নিজের স্বার্থেই পরকালের মুক্তির সঠিক পথ নিজেই বেছে নেয়া।

www.draminlibrary.com

পরকালে মুক্তির পথ একটাই

অনেকের ধারণা যার যার ধর্ম সে সে পালন করলে প্রত্যেক জাতির লোকই পরকালে মুক্তি পাবে। কিন্তু এ ধারণা কি ঠিক? এর সঠিক জবাব পেতে হলে আপনাকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় কি জাতি হিসেবে না-কি মানুষ হিসেবেই? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় মানুষ হিসেবেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহর প্রত্যেকটি ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের জন্য একইভাবে কার্যকর রয়েছে। যেমন দেখুন, খাদ্যের ব্যাপারে প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুই প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্য একই প্রকার ফল দেয়। ঠিক তেমনই রোগ চিকিৎসার বেলায়ও প্রত্যেক জাতির লোকের একই রোগে একই ঔষধ প্রয়োজন হয়। আমরা এরূপ কখনও দেখিনা যে, মুসলমানদের কলেরায় স্যালাইন, হিন্দুদের কলেরায় কুইনাইন, খ্রীষ্টানদের কলেরায় এটেভীন, বৌদ্ধদের কলেরায় স্যাফাক্রিন, নাস্তিকদের কলেরায় নোভালজীন। এ ধরনের কোন ব্যবস্থা যেমন পার্থিব জীবনে নেই, ঠিক তেমনই পরকালীন জীবনেও বিভিন্ন জাতির মুক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকার কোন ব্যবস্থা নেই। যে কোন জাতির লোকের একই রোগের যেমন একই ঔষধ প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনই পরপারের জীবনেও একই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রত্যেকের মুক্তি আসবে এইটাই যুক্তি। একই রাষ্ট্রে যেমন এমন কোন আইন থাকতে পারে না যে, কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে আর কেউ চুরি করলে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে; ঠিক তেমনই আল্লাহর আইনও এমন হতে পারে না যে, কেউ দেবতার পূজা করলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং কেউ তা করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে বা তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। সঠিক যুক্তি হচ্ছে এই যে, একই আল্লাহর আইন তার সৃষ্টি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একই প্রকার হতে হবে। অর্থাৎ পরকালে মুক্তির জন্য হরিদাস বাবুর জন্য যদি দুর্গাপূজার দরকার হয়, তবে আবদুল্লাহ সাহেবের জন্যও তা দরকার হবে এবং দরকার হবে তা পোপ পলের জন্যও। আর যদি ইসলামী বিধান মেনে চলার প্রয়োজন হয় পরকালের মুক্তির জন্য তবে এটাই প্রয়োজন হবে প্রত্যেকের জন্য। এটাই যুক্তি এবং এটাই বিবেকের সাক্ষ্য। এছাড়া বিবেক আরও সাক্ষ্য দেবে যে,

www.draminlibrary.com

এন্ড্রিন যেমন সব জাতের মানুষের জন্যই বিষ ঠিক তেমনই পরকালের জীবনের জন্য যা বিষবৎ বা যা হবে জাহান্নামের কারণ তা প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্যই হবে জাহান্নামের কারণ।

এখন প্রশ্ন, তা হলে মুক্তির সঠিক পথ কোনটা? যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখি যে কোন্ পথটা আল্লাহর দেয়া। যুক্তিতে যেটাই আল্লাহর দেয়া সঠিক পথ হিসাবে ধরা পড়বে, আসুন আমরা সেইটাকেই গ্রহণ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে যাই। কারণ মৃত্যুর হাত থেকে যখন বাঁচার কোন পথ নেই, মরতে যখন হবেই আর মরার পরে যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে যেতে হবে এবং সেখানে যেহেতু কোন গোঁড়ামী কাজে লাগবে না আর যেহেতু সে জীবনের সুখ-শান্তিও আমরা চাই; তাই যার যার নিজের স্বার্থেই আসুন আমরা সব ধরনের গোঁড়ামী দূর করে নিরপেক্ষ ভাবে যাচাই বাছাই করে দেখি যে, ধর্ম আসলে কোনটা আল্লাহর দেয়া, কোনটা মানুষের তৈরি।

আল্লাহর ধর্ম প্রত্যেকের নিজের ধর্ম

মনে রাখতে হবে আল্লাহর দেয়া আবহাওয়া যেমন প্রত্যেকের জন্যই ঠিক তেমনই আল্লাহর দেয়া ধর্ম প্রত্যেকের জন্যই। আল্লাহর দেয়া চাঁদ সূর্য যেমন কোন গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয় তেমন আল্লাহর ধর্মও কোন গোষ্ঠী বিশেষের নিজস্ব কিছু নয়। একই মায়ের ১০ জন পুত্রের জন্য তাদের মা যেমন কারও একটু বেশি মা এবং কারও একটু কম মা নয়, ঠিক তেমনি ইসলাম যদি আল্লাহর দেয়া ধর্ম হিসাবে প্রমাণিত হয় তবে তা (ইসলাম) কারও জন্য কম ও কারও জন্য বেশি অধিকারের হবে না। তা হবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজস্ব ধর্ম। যেমন ১০ জন সন্তানের মা তার প্রত্যেক সন্তানের সম অধিকারের মা।

অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টি হল কি করে

হযরত আদম (আঃ) প্রথম মানুষ ছিলেন এবং প্রথম নবীও ছিলেন। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই বিবেক বুদ্ধিকে আল্লাহ কিভাবে কাজে লাগাতে চান তা বলে দেয়ার উদ্দেশ্যে, ভিন্ন

www.draminlibrary.com

কথায়, মানুষের সঠিক জীবন-ব্যবস্থা কি হবে তা বলে দেয়া ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ নবী রাসূল পাঠান। আর তা পাঠানোর ধারা হলো যখন যে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তখন সেই ধরনের সমাধান দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। এভাবে ১ লাখ ২৪ হাজার অথবা ২ লাখ ২৪ হাজার পয়গাম্বর আল্লাহ পাঠিয়েছেন। তাহলে একথাও মানতে হবে যে, আমাদের এদেশেও কোন নবী রাসূল এসেছিলেন; যাদের নাম আমাদের জানা নেই। হয়ত হতে পারে যে, শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগে তাঁরা নবী ছিলেন। তাঁরা নবী ছিলেন একথাও যেমন বলছিনা, তেমন তাঁরা নবী ছিলেন না একথাও বলা যায় না— কারণ, আল কুরআনে সব নবীর নাম নেই, কিন্তু নবীর সংখ্যা বহুত ছিল এটা আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি। এ কারণেই বলেছি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগে হয়তো তাঁরা নবী ছিলেন এবং তাঁরা তওহীদেরই প্রচারক ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁদের ভক্ত অনুরক্তগণ হয়ত ইতিহাস বিকৃত করে তাঁদের নামে কোন কলংক জুড়ে দিয়েছে এবং পরবর্তী নবীকে গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে মানতে না পেরে তারা পূর্ব নবীর অনুসারী থাকার নাম করে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করে নিয়েছে। যেমন মূসা (আঃ) এর কিছু উম্মত গোঁড়ামির কারণে পরবর্তী নবী হযরত ঈসা (আঃ)কে মানতে না পেরে তারা ইয়াহুদী জাতিতে পরিণত হলো। ঠিক ঐ একই কারণে হযরত ঈসা (আঃ) এর কিছু উম্মত পরবর্তী ও শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)কে মানতে না পেরে খৃষ্টান জাতিতে পরিণত হলো। এভাবেই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মুসলমান জাতি এমন একটা কথায় বিশ্বাস করি, যা অন্য কোন জাতিই বিশ্বাস করতে পারে না। পারলে তাদের ধর্মও আর টিকে না; তা হচ্ছে এই যে, আমরা সব নবীকেই মানি। আর তা না মানলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না। কিন্তু অন্য কোন জাতিই সব নবীকে মানতে পারে না। আমরা যে সব নবীকে মানতে পারি এবং কিভাবে মানি তা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করছিঃ যেমন, আমাদের এ উপমহাদেশে এমন একদিন ছিল যে দিন বৃটিশ সরকারের রাজত্ব ছিল। তখন আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম বৃটিশ সরকারের নাগরিক। পরে এলো পাক সরকার তখন আমরা ছিলাম পাক সরকারের নাগরিক। তারপর এলো বাংলাদেশ সরকার

www.draminlibrary.com

বর্তমানে আমরা বাংলাদেশ সরকারের নাগরিক। এখন আমরা প্রত্যেকেই বৃটিশ সরকার ও পাক সরকারকে এক কালের সরকার হিসেবে মানি ঠিকই কিন্তু আইন মেনে চলি বর্তমান সরকারের। এই সরকারের আমলে যদি কেউ দাবি করে যে, আমি বৃটিশ সরকারের আইন মেনে চলবো এবং বর্তমান সরকারের আইন মানবো না তাহলে সে ব্যক্তি যে পর্যায়ের অপরাধী হবে ঠিক সেই একই পর্যায়ের অপরাধী হবে তারা যারা বর্তমান শেষ নবীর আমলের মানুষ হয়ে পূর্ববর্তী নবীর আইন মেনে চলতে চাইবে। আমরা মুসলমান জাতি অন্যান্য সব নবীকেই মানি। যেমন এ উপমহাদেশের প্রত্যেকেই বৃটিশ সরকারকে তদানিন্তন আমলের সরকার বলে মানি। ধর্মের বেলায়ও ঐ একই নীতি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ যদি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ সত্যই আল্লাহর পাঠানো নবী হতেন আর আমরা যদি সেই যুগের মানুষ হতাম, তাহলে তাদের আইন বা শরীয়ত আমাদের মেনে চলতে হতো। কিংবা যদি হযরত ঈসা (আঃ) বা মূসা (আঃ)-এর যুগের মানুষ হতাম তবে তাদের আইনই আমাদের মেনে চলতে হতো। নইলে অবশ্যই আমাদেরকে জাহান্নামি হতে হতো। কিন্তু যেহেতু আমাদের জন্ম হয়েছে শেষ নবীর আমলে তাই আমাদের মেনে চলতে হবে শেষ নবীকেই।

এতটুকু সহজ সরল বুঝ যাদের মস্তিষ্কে ঢুকে যায় তারা আর অমুসলিম থাকতে পারে না; যার নজীর শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান।

"ইসলামই একমাত্র খাঁটি ধর্ম"

"ইসলামই একমাত্র খাঁটি ধর্ম" অন্য কথায় সৃষ্টিকর্তা মনোনীত জীবন বিধান। তার স্বপক্ষে অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। পাঠকদের খেদমতে নিম্নে কয়েকটি সহজ যুক্তি পেশ করছিঃ

১ নং যুক্তি ঃ

ধর্মের নামকরণে সার্বজনীনতা

যা খাঁটি ধর্ম তার নামটাও হবে একটা যুক্তিসংগত নাম। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ পৃথিবীতে মোট যত ধর্ম আছে তার প্রত্যেকটির নামই সেই

www.draminlibrary.com

ধর্মের প্রবর্তকের নামানুসারে হয়েছে, যেমন যীশুখ্রীষ্টের নামানুসারে খ্রীষ্টান ধর্ম, মহাবীর জৈনের নামানুসারে জৈনধর্ম, গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে বৌদ্ধধর্ম, হেন্দের নামানুসারে হিন্দুধর্ম, কিন্তু ইসলাম ধর্মের নাম কোন ব্যক্তির নামানুসারে নয়। যদি এ ধর্মের নাম মোহাম্মদী ধর্ম হতো তাহলে নামকরণের দিক থেকে অন্য ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে অবশ্যই কোন পার্থক্য থাকতো না। কিন্তু এ (ইসলাম) ধর্মের নাম এমনই একটি সার্বজনীন শব্দ দ্বারা রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। কারণ মানব জীবনের মৌলিক আকাঙ্খাই হচ্ছে জীবনে শান্তিলাভ করা আর ইসলাম মানেও শান্তি। তাহলে প্রমাণ হলো মানব জীবনে যে নিয়ম নীতি মেনে চললে জীবনে শান্তি লাভ হতে পারে সেই নিয়ম নীতিই মানব ধর্ম হওয়া উচিত এবং তার নামটাও 'শান্তি' হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাই আল্লাহ পাক মানব জীবনের শান্তির জন্যে যে সব নিয়মনীতি নবী রাসূলগণের মাধ্যমে দান করেছেন সেই সব নিয়মনীতির নাম আল্লাহ রেখে দিলেন ইসলাম বা শান্তি। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হল অন্ততঃপক্ষে নামকরণের দিক থেকে 'ইসলাম' নামটা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও সার্বজনীন নাম। কাজেই বহু ঐতিহাসিক ইসলাম ধর্মকে মানবধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন বিশেষ জাতির ধর্ম নয়– এটা গোটা মানব জাতির ধর্ম। আল্লাহর দেয়া সূর্যের কিরণ যেমন কোন বিশেষ গোষ্ঠির জন্য নয় বরং তা দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের জন্যই; ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর দেয়া ধর্মও কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়; তা প্রতিটি মানুষের জন্যই। কাজেই এ হেন ধর্মের নাম কোন ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে হতে পারে না। এর নামটা হতে হবে সার্বজনীন যেন তা সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে। অতএব, ইসলাম বা শান্তি কথাটাও যেমন সার্বজনীন এ নামের ধর্মটাও তেমন সার্বজনীন।

২নং যুক্তি ঃ

ধর্মকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে

যা আল্লাহর দেয়া ধর্ম তা অবশ্যই আংশিক জীবন ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ নয়। কারণ একদিকে আল্লাহকে মানবো সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বোচ্চ

www.draminlibrary.com

ক্ষমতার মালিক হিসেবে আর অন্য দিকে যদি অন্য কোন সত্ত্বাকে কোন বিশেষ বিষয়ের ব্যবস্থাপক বলে মানতে হয় তবে প্রকারান্তরে মানা হয় যে,আল্লাহর বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ অজ্ঞ (নাউজুবিল্লাহ)। এটা যেমন আল্লাহ সম্পর্কে অযৌক্তিক ধারণা তেমন আল্লাহর দেয়া ধর্মকে গ্রহণ করার পর জীবনের যে কোন ব্যাপারে আর অন্য কারও নিকটেই কোন কাজের জন্য বিধান চাওয়া যেতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর দেয়া ধর্মকে অবশ্যই স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে এবং যত প্রকার সমস্যা মানব-জীবনে সৃষ্টি হতে পারে তার সব সমস্যার সমাধান আল্লাহর দেয়া ধর্মে থাকতে হবে এটাই যুক্তি। দেখা যায় আজ পর্যন্ত যত প্রকার ধর্ম পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই দাবি যে, তা স্বয়ং সম্পূর্ণ। এছাড়া আর কোন ধর্মই একথা দাবি করতে পারেনি যে, তা সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। অর্থাৎ জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামে পূর্ণাঙ্গ বিধান রয়েছে। ইসলামে রয়েছে শিক্ষা সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ-সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের আইন-কানুন যা অন্য কোন ধর্মে নেই।

৩নং যুক্তি ঃ

ধর্মীয় আইন হতে হবে নির্ভুল

দেখা যায় পৃথিবীতে এমন বহু ধর্ম রয়েছে যার ধর্মীয় আইন মানুষকেই সংশোধন করতে হয়। যেমন সতীদাহ প্রথা ছিল একটা ধর্মীয় আইন, যা মানুষের নজরে ভুল আইন হিসেবে ধরা পড়লো। ফলে ঈশ্বরের ভুল আইন মানুষকেই সংশোধন করতে হলো। তাই অনেকেই বিভিন্ন ধর্ম থেকে এসে কেন মুসলমান হয়েছে তার জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, "অন্যান্য ধর্মের ভুলত্রুটি সংশোধন করে মানুষ আর মানুষের ভুলত্রুটি সংশোধন করে ইসলাম; ইসলামের এই মাহাত্ম্য দেখেই মুসলমান হয়েছি।" এ গৌরব একমাত্র ইসলাম করতে পারে যে এর কোন একটি কথাও অবৈজ্ঞানিক নয়।

www.draminlibrary.com

৪নং যুক্তি ঃ

ধর্মীয় বিধান পক্ষপাতহীন হতে হবে

সৃষ্টিকর্তা যেমন সবার কাছে সমান তেমনই তাঁর আইনও হতে হবে সবার জন্য সমান অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর বাণী হিসেবে কুরআনের প্রতি সবার থাকতে হবে সম অধিকার। অবশ্য ইসলামের ক্ষেত্রে তা আছেও। কিন্তু দেখা যায় কোন কোন ধর্মের ব্যাপারে তা নেই। যেমন বেদে শুদ্রদের কোন অধিকার নেই। তাছাড়া ইসলামে যা ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম রয়েছে তা প্রত্যেকের জন্য একই হুকুম অর্থাৎ প্রত্যেককেই একই নিয়মে ইবাদত করতে হবে। এখানে কারও জন্যই কিছু মাফ নেই বা কন্সেশন নেই। কিন্তু কোন কোন ধর্মে দেখা যায় উপাসনা সবাইকে করতে হয় না। এমন কি সবার উপাসনার অধিকার পর্যন্ত নেই। যেমন হিন্দু ধর্মে উপাসনার যাবতীয় মন্ত্র পাঠ ও অনুষ্ঠানাদি পালন করে শুধু মাত্র পুরোহিতগণ আর অন্যান্যরা শুধু সেখানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি করে মাত্র। তাদের কোন মন্ত্র পড়ার প্রয়োজন হয় না। খ্রীষ্টানদেরও সবাইকে সমানভাবে একই নির্দিষ্ট পন্থায় কোন উপাসনা করতে হয় না। যেমন করতে হয় মুসলমানদের নামায রোযাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাছাড়া দেখা যায় হিন্দুদের বেলায় এমন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে যা অবশ্যই পক্ষপাতমূলক। যেমন পূজার পৌরোহিত্ব করার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই আছে এবং তা আছে জন্মসূত্রে। এতে আর কারও কোন অধিকার নেই তা সে যতই ধার্মিক হোক না কেন। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণদের পূজা অর্চনার যে অধিকার রয়েছে সে অধিকার কেড়ে নেয়ারও অধিকার কারও নেই তা সে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ কাট্টা নাদান কিংবা চারিত্রিক দিক থেকে সর্বজন ধিকৃত হলেও। তা ছাড়াও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের পিতা মাতার মৃত্যুতে যে কয়দিন শোক পালন করতে হয় তার মেয়াদ হচ্ছে ৩০ দিন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বেলায় পালন করতে হয় মাত্র ১১ দিন। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধান মুতাবিক আজই যদি কোন মুচি-মেথরও মুসলমান হয় তবে ইসলামী বিধান মুতাবিক কালই সে ব্যক্তি একজন আওলাদে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়েও ইমামতি করার অধিকার রাখে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো

www.draminlibrary.com

যে, একমাত্র ইসলামেই কোন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব নেই। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মে দস্তুরমত পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

খ্রীষ্টানদের বেলায় উপাসনা ধর্ম যাজকদের জন্য। আর অন্যান্যদের জন্যে শুধু যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট; তাতেই নাকি তাদের মুক্তি।

কিন্তু ইসলামের বেলায় সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। এখানে শুধু বিশ্বাসে কোনই ফায়দা নেই। তাকে বিশ্বাস মুতাবিক প্রতিটি কাজই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী করতে হবে— এতে কারও কোন কন্‌সেশন নেই।

৫নং যুক্তি ঃ

পৈতৃক ধর্ম অপেক্ষা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য না হলে কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে না

যারা অশিক্ষিত ও ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের বাদ দিলে দেখা যায়, যারাই শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি তারা কেউই কোনদিন ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে অধিক যুক্তিগ্রাহ্য মনে করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে এমন কোন কথা ইতিহাসে নেই। পক্ষান্তরে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের কথা আছে, এমন কি অনেক রাজা বাদশাদের কথাও ইতিহাসে আছে যে, তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিছু অশিক্ষিত লোককে— যারা আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল তাদেরকে— অর্থের লোভ দেখিয়ে খ্রীষ্টান করা হয়েছে এমন ইতিহাস যে আছে আমি স্বীকার করি। কিন্তু এমনটি কেউ দেখাতে পারবে না যে, কোন ধার্মিক মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে বা ইসলামের ওপর ব্যাপক পড়াশুনা করে ধর্মের অসারতা দেখে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং খ্রীষ্টান বা হিন্দু হয়ে নব-খ্রীষ্টান বা নব-হিন্দু নাম দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যেমন নও-মুসলিম মরহুম মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য নও-মুসলমানদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এমনকি কোন নযীর আছে পৃথিবীর ইতিহাসে? অর্থাৎ মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য যেমন হিন্দুদের পুরোহিত হয়ে হিন্দুধর্ম ভালভাবে পড়াশুনা করে দেখলেন এটা ভুল। পরে খ্রীষ্টানদের

www.draminlibrary.com

ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখে বুঝলেন এটাও অচল। এর পরে ইসলামের ওপর পড়াশুনা করে বুঝলেন যে এইটাই সঠিক। অবশেষে এইটাই তিনি গ্রহণ করলেন এবং কেন তিনি খ্রীষ্টান হলেন না এবং কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য কতগুলি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করলেন। আর সে মহাসত্যকে গোটা জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য যে ভাবে একটা সংগঠন গড়ে তুললেন তেমন কোন ঘটনা পৃথিবীর কোথাও কোন দিন ঘটেছে, তার কি কোন প্রমাণ আছে? অর্থাৎ মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য যেমন ছিলেন হিন্দু জাতির পুরোহিত তেমন মুসলমানদের কোন ইমাম সাহেব কি ইসলাম ধর্মের যাবতীয় গ্রন্থাদি পড়ে ইসলামের অসারতা বুঝতে পেরে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন বই পুস্তক রচনা করেছেন যেমন করেছেন মরহুম ভট্টাচার্য সাহেব। গোটা পৃথিবী মন্থন করেও কি এই ধরনের কোন নজীর উপস্থিত করতে পারবেন? তা অবশ্যই কেউ পারবেন না।

৬ নং যুক্তি ঃ

ধর্মীয় গুরুব্যক্তিগণকে হতে হবে সবার জন্য আদর্শ

কোলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে এম, এস, সি, পাশ একজন নও মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কি দেখে মুসলমান হলেন? তিনি জবাবে বললেন, হিন্দুদের যারা পূজনীয় ব্যক্তি তাদের আদর্শ যদি আজ পৃথিবীর সর্বত্র কায়েম হতো তবে সারা পৃথিবীর অবস্থা আজ কি হতো তা চিন্তা করে আমি মুসলমান হয়ে গেছি। তিনি বললেন আজ যদি দেশের যুবক ছেলেরা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ করে যুবতি মেয়েদের কাপড় নিয়ে গাছে ওঠে বসে থাকে তাহলে সমাজের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়। আরও বললেন যদি আজ দ্রৌপদির ন্যায় কেউ পাঁচটা স্বামী গ্রহণ করে তাহলেই বা সমাজের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। এই ধরনের অনেকের কথাই তিনি বললেন যা তার মুখে নও-মুসলিম হিসেবে শোভা পেলেও আমার কলমে লেখা আমি লজ্জাষ্কর মনে করে লিখলাম না কিন্তু হিন্দু ভাইয়েরা প্রত্যেকেই মনে মনে তা বুঝবেন। বিশেষ করে এই বিংশ শতাব্দীতেও শিবের লিংগ পূজার ন্যায়

www.draminlibrary.com

দৃষ্টান্ত রয়েছে। এসবও কি ধর্মীয় কাজ হতে পারে? এই সব দেখে শুনে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি চিন্তা করেছি যে, কোথায় হিন্দুদের ভগবানের লীলা আর কোথায় মুসলমানদের নবী-রাসূলগণের আদর্শ চরিত্র। এসব চিন্তা ভাবনা করে আমি আর হিন্দু থাকতে পারলাম না। এ ধরনের অনেক কিছুই তিনি বললেন।

৭নং যুক্তি ঃ

আল-কুরআনই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানসম্মত ধর্মগ্রন্থ

একদিকে যেমন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মই একখানা পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ দিতে পারে না। তেমন কুরআনে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা নাযিল হয়েছে ১৪ শত বছর পূর্বে আর তার সত্যতা প্রমাণ হচ্ছে আজ এই বিংশ শতাব্দীতে। এই কুরআনের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আর কোন ধর্মগ্রন্থেই নেই। যেমনঃ-

(১) কুরআনের ভাব-ভাষা এমনভাবে সুবিন্যস্ত যার অনুরূপ একটি সূরা আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি।

(২) যার উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি বা কোন কথাকেও আজ পর্যন্ত কেউ অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করতে পারেনি।

(৩) পৃথিবীর সব ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যদি পুড়িয়ে দেয়া হয় তবে নতুন করে হাফেজদের মাধ্যমে কুরআন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।

(৪) সর্বশেষ মিশরের তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ এরশাদ খলিফার দ্বারা এমন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার হয়েছে যা সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, আল-কুরআনের শব্দ, অক্ষর, যের, যবর, পেশ, নোক্তা অনোক্তা ইত্যাদির প্রত্যেকেটির মধ্যে এমন এক নিখুঁত হিসাব রয়েছে যা কাম্পউটারে ধরা পড়বে বা গণনায় মিল পড়বে যা রচনা করা কোন আদম সন্তানের পক্ষেই সম্ভব নয় যে তেমন ধরনের হিসাব নিকাশ করে কোন গ্রন্থ

www.draminlibrary.com

কেউ লিখতে পারে। যেমন তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ এরশাদ খলিফা হিসাব করে দেখেছেন 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর মধ্যে অক্ষর রয়েছে ১৯টি। তিনি দাবি করেন গোটা কুরআনের মধ্যে এই ১৯ সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্ববহ। তিনি হিসাব করে দেখেছেন 'ইস্‌ম' শব্দটি কুরআনে ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'বিস্‌ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩ বার। এই দুই সংখ্যাকে গুণ করলে গুণফল হয় ১৯×৩=৫৭। এই ৫৭ বারই আল-কুরআনে 'আর-রাহমান' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'রহম' শব্দটি আল-কুরআনে এসেছে ১১৪ বার এবং এই ১১৪টিই হচ্ছে কুরআনের মোট সূরার সংখ্যা আর এই ১১৪ সংখ্যাই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এছাড়াও তিনি হিসাব করে দেখেছেন যে সব সূরার পূর্বে কাটা কাটা অক্ষর রয়েছে যেমন অলিফ–লাম-মীম, ইয়া-সীন, আলিফ-লাম-রা, ত্বা-হা ইত্যাদি। এই ধরনের সূরা মোট ২১টি রয়েছে। এসব সূরার অক্ষর কম্পিউটারের সাহায্যে হিসাব করে দেখা গেছে যে সূরার পূর্বে যে পৃথক পৃথক অক্ষর দিয়ে সূরা আরম্ভ করা হয়েছে, ঐ অক্ষর গোটা সূরার মধ্যে যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন সূরা ক্বাফ এর মধ্যে 'ক্বাফ' অক্ষরটি আছে ৫৭ বার, এই ৫৭ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এইভাবে সূরা ইয়াসীনে 'ইয়া' যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য এবং 'সীন' যতবার আছে তাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। বলুন, এইভাবে হিসাব-নিকাশ করে কোন বই লেখা মানুষের দ্বারা কি সম্ভব?

৮নং যুক্তি ঃ

ধর্মের দৃষ্টিতে সাধু ব্যক্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে যারা সাধু বা পুণ্যবান ব্যক্তি তাঁরা হচ্ছেন হক্কানী আলেম, পীর বোজর্গ, সুফি-দরবেশ ইত্যাদি– যারা কেউই অশিক্ষিত নন। যাদেরই চরিত্রে কোন খুঁত নেই তাঁরাই হচ্ছেন ইসলামের দৃষ্টিতে সাধু এবং তাঁরা সংসার ত্যাগী নন।

হিন্দু ধর্ম মতে যারা সাধু তাদেরকে দেখা যায় অশিক্ষিত, গেরুয়া বসন পরিহিত, চিমটাধারী, সংসার ত্যাগী, শ্মশানে বসবাসকারী। যাদের সংগে কিছু

www.draminlibrary.com

বিধবা নারী কদুর বস হাতে নিয়ে ঘোরা ফেরা করেন ও শ্মশানে একত্রে বসবাস করেন। আর কোলকাতার কালিঘাট মন্দিরের সামনে দেখা যায় কিছুলোক মাথায় মেয়েদের ন্যায় লম্বা চুল রাখেন আর সমস্ত শরীরে ছাই মেখে উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকেন। তাদেরকে বলা হয় নেংটা সাধু। আর বিদেশীদের নিকট 'পায়াস' ও 'অনেষ্ট ম্যান' বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় তাদেরকেই।

ওদিকে খ্রীষ্টানদের যারা ধর্মীয় নেতা অথবা সাধু তাঁরা কিন্তু একজনও বিবাহিত নন। কাজেই তাঁরা একজনও সাধুর ব্যাটা সাধু নন। অর্থাৎ যারা ফাদার, বিশপ বা পোপ তাঁরা কেউই ফাদার বিশপ বা পোপের পুত্র নন, কারণ তাদের পিতা পোপ, বিশপ বা ফাদার হলে তো বিবাহই করতেন না। কাজেই প্রথমেই একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, আর যাই হোক তারা কোন ধার্মিক লোকের সন্তান নন। তাছাড়া এই সব ধার্মিক– যারা বিবাহিত নন এবং যারা সিস্টারদের সঙ্গেই বাস করেন আর যাদের মধ্যে মানবীয় যৌন প্রবৃত্তি রয়েছে তারা– কি এ কথা বলতে পারেন যে তারা রমণী স্পর্শ করেন না? তাঁরা যদি বলেনও তবু কি মানুষ এ যুক্তি বিরোধী কথা মেনে নিতে পারবে? তবে দৃষ্টিভঙ্গী যদি তাদের এরূপ হয় যে, ধর্মগুরুর বিবাহটাই দোষের কাজ কিন্তু যৌন আচরণটা কোন দোষের কাজ নয়, তবে সেটা ভিন্ন কথা। হাঁ তবে একথা সত্য যে, দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর বিধানের অধীন। কাজেই আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে চলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন বাঁচতে হলে খাওয়া, পান করা, প্রস্রাব-পায়খানা, ঘুম ইত্যাদি বাদ দিয়ে বাঁচা যায় না, ঠিক তেমনই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করাটাও যেহেতু আল্লাহর বিধান কাজেই আল্লাহর এ বিধানকে বাদ দিয়েও চলা যায় না। আল্লাহর এ বিধানটাকে অর্থাৎ যৌন প্রবৃত্তিকে যারা দমন করে রাখার দাবি করেন তারা হয় তাদের অবৈধ যৌন আচরণের কথা গোপন করেন অথবা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেন যা সহ্য করা সাধ্যের বাইরে।

www.draminlibrary.com

একটি প্রশ্ন ঃ একটি চিন্তার বিষয়

ধরুন পৃথিবীর তিনটি ভূখণ্ড বাংলাদেশের তিনটি ধর্মের সাধু ব্যক্তিদের জন্য বেছে নেয়া হলো—একটি হিন্দুদের, আরেকটি খৃষ্টানদের এবং অপরটি মুসলমানদের সাধু ব্যক্তিদের জন্য। এরপরে এক একটা ভূ-খণ্ড এক এক জাতের সাধু ব্যক্তিদের রেখে আসুন, এর কিছুদিন পর ঐ ভূ-খণ্ডগুলি ভিজিট করে আসুন, দেখুন কোনটার কি অবস্থা হয়েছে।

হিন্দু-সাধুদের ভূ-খণ্ডে গেলে আপনার সবকিছু দেখে মনে হবে যেন ৫/৬ হাজার বছর পূর্বের দুনিয়ায় এসে পড়েছেন। অর্থাৎ ৫/৬ হাজার বছর পূর্বে বনে জঙ্গলে বসে যে-সব মুনি-ঋষি তপজপ করতেন সেইখানে এসে পড়েছেন। সেখানে দেখা যাবে কদুর বস হাতে বৈরাগীদের আর দেখা যাবে সন্যাসীদের। তাদের বেশির ভাগ দেখা যাবে শ্মশান ঘাটে। আর কোলকাতার কালিঘাট মন্দিরের সামনে গায়ে ছাই মাখানো যেসব উলঙ্গ সাধু আছে তাদেরকেও সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে। যা দেখে মনে হবে যেন সভ্যতার কোন ছোঁয়া তারা পায়নি। ২নং ভূ-খণ্ড যেখানে খৃষ্টান সাধু ব্যক্তিগণ বাস করেন সেখানে ৫০ বছর পর একটি লোকও পাবেন না, কারণ তাদের যারা সাধু তারা কেউই বিবাহিত নন। কাজেই ৫০ বছর পর নতুন কোন সন্তান সন্তুতিও সেখানে জন্ম নেবে না। ফলে সে ভূ-খণ্ড জনশূন্য হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। আর পৃথিবীর সব খৃষ্টান যদি সাধু হয়ে যায় তবে ৫০ বছর পর এ পৃথিবীতে আর একটি খৃষ্টানও পাওয়া যাবে না। এ কারণেই তাদের ধর্মে সবার ধার্মিক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর একটি একান্ত সত্য কথা হল এই যে খৃষ্টানদের কোন সাধুই সাধুর বেটা নয় কারণ তাঁর পিতা সাধু হলে তো বিয়েই করতেন না। তাঁদের যত সাধু সবাই কিন্তু সাধারণ লোকের ছেলে। আমি বলি না তারা কোন খারাপ লোকের ছেলে। তবে তাঁরা যে, কোন সাধু ব্যক্তির সন্তান নন, এটা তাদের ধর্মেরই বিধান, এটা তাদের নামে কোন গালাগালি নয় বা কোন প্রকার কুৎসাও নয়। যা বাস্তব শুধু তাই বলছি। হাঁ তবে একটি কথা বলা দরকার তা হচ্ছে এই যে, একমাত্র ঈসা (আঃ) ছাড়া সব নবীই বিবাহ করেছেন। আর ঈসা (আঃ) এর অনুগত অনুসারী হওয়ার জন্য খৃষ্টান সাধুগণ বিবাহ করেন না। কিন্তু এর

www.draminlibrary.com

ভিতরে এমন একটি মহাসত্য লুক্কায়িত আছে যা হয়ত খৃষ্টান সাধুগণ চিন্তা করেন না। তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বিনা পিতার সন্তান তাই হয়ত দৈহিক পৌরুষত্বে জন্ম সূত্রেই কিছুটা দুর্বল ছিলেন। যার ফলে তিনি বিবাহের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নবী হিসেবে বিবাহ নিষেধ করেননি।

তৃতীয় ভূ-খণ্ডে যেখানে মুসলমান সাধুদের রেখে আসা হয়েছিল সেখানে গেলে দেখা যাবে একটা বেহেশতি কল্যাণ রাষ্ট্র সেখানে কায়েম হয়ে গেছে। মুসলমানদের সাধু ব্যক্তি যেহেতু প্রতিটি বিভাগেই আছে তাই মুসলমান সাধুদের বেছে নিলে সেখানে যেমন পুরুষ যাবে তেমন মেয়েও যাবে। সেখানে যেমন আলেম মৌলভী যাবেন তেমন সেখানে কুলি মজুরও যাবে। সেখানে প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারী থাকবেন। পুলিশ মিলিটারীও থাকবেন, সব ধরনের কারিগরও থাকবেন এবং ব্যবসায়ীও থাকবেন। কারণ মুসলমানদের সুফী মোত্তাকীন পরহেজগার লোক সব ক্ষেত্রেই আছে। আর এই ধরনের সৎলোকগুলিই যদি কোন এক ভূ-খণ্ডে একত্রিত হতে পারেন তবে সেখানে যে বেহেশতী রাষ্ট্র কায়েম হবে তা না বললেও বুঝতে কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এবার চিন্তা করুন, যে ধর্মের সাধু ব্যক্তিদের দ্বারা একটা দেশ চলতে পারে না; সে ধর্ম কি করে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হতে পারে? এই যুক্তিতে খ্রীষ্টান ধর্ম যে যুক্তগ্রাহ্য নয় তা প্রমাণ হলো। অতঃপর হিন্দু-সাধুদের বেলায় দেখুন তাদের সাধুদের ভূ-খণ্ডকে কেউ কি সভ্য লোকের ভূ-খণ্ড হিসেবে স্বীকার করবে? হাঁ তবে যারা যুক্তি মানতে নারাজ তাদের কথা ভিন্ন। আমার আপনার দায়িত্ব হলো লোকদের বুঝানো। আপনি আমাকে বুঝাবেন কিন্তু আমি যদি না বুঝার শপথ করি তবে কেউই আমাকে বুঝাতে পারবেনা। যেমন আমি যদি জিদ ধরি যে, আমার পিতার বিশ্বাস ছিল পৃথিবী একটা গুরুর শিং এর ওপর আছে আমি সে বিশ্বাস কোন প্রকারেই ত্যাগ করবো না, তবে আপনার কি করার আছে বলুন। এমন লোকও আমাদের সমাজে কিছু আছে। তাদের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই এবং কিছু করারও নেই।

www.draminlibrary.com

আর একটি চিন্তার বিষয়

কোন ধর্ম কি কোন আঞ্চলিক ধর্ম হতে পারে? প্রত্যেকেই বলবেন তা পারে না। এবার চিন্তা করুন হিন্দু ধর্মের যাবতীয় ইতিহাস আর কর্মকাণ্ড সবই ভারত কেন্দ্রিক। তা হলে প্রশ্নঃ হিন্দুদের ভগবান কি শুধু ভারতই চেনেন এবং অন্যান্য দেশ সম্পর্কে কি তিনি কোন খোঁজ খবর রাখেন না। আর তা যদি রাখতেনই তবে অন্য দেশ সম্পর্কে কিছু না কিছু কথাতো বেদ পুরানে থাকতো। যেমন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ আল-কুরআনে শুধু পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি– মাটির নীচের সমুদ্রের তলদেশে, আকাশে, সাত তবক আকাশের ওপরে কোথায় কি আছে, না আছে তার কোন তথ্য দিতেও ভুল করেনি। শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী হিন্দু ভাইয়েরা কি এসব বিষয় নিয়ে কখনও কোন চিন্তা ভাবনা করেন না? আমার একান্ত অনুরোধ পরকালের মুক্তির জন্য যার যার নিজের স্বার্থে আমার কথাগুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনা করবেন। দেখুন, মৃত্যুর পর এমন একটা সময় আসবে যখন আর চিন্তার সময় থাকবে না এবং ঐ জীবনের কোন শেষও হবে না। তাই বলি অত্যন্ত সরল নিরপেক্ষ মন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, সত্যই আপনার গোঁড়ামির কারণে যদি আপনার অনন্তকালের জীবনকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে হয় তবে সেইটাই কি ভাল হবে? না কি এখন থেকে সময় থাকতে হুঁশিয়ার হওয়া ভাল হবে। এরপর অবশ্যই এমন একটা দিন আসবে যেদিন প্রত্যেকটি ভ্রান্ত লোক অস্থির হয়ে কাঁদবে এবং বলবে "লাওকুন্না নাসমায়ু আও না'কিলু মা কুন্না ফি আসহাবিস সায়ীর– "হায় সেইদিন যদি মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শুনতাম এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে সুস্থ জ্ঞানে বুঝে দেখতাম তা হলে আজ আমাকে এই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হতো না"– এই বলেছেন আল্লাহ। কাজেই আসুন আমারও যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক এবং আপনারও যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক অন্ততঃ তার কথার গুরুত্ব দিয়ে আমরা সঠিক ধর্ম কোনটা তা বুঝার ও তা গ্রহণ করার চেষ্টা করি।

অতঃপর আমি পূর্ণ ঈমান ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করছি যে, মৃত্যুর পর অবশ্যই এমন একটা দিন আসবে যে দিন চোখের সামনে বেহেশত থাকবে এবং দোজখও থাকবে। তখন অবশ্যই মনে করতে হবে যে, আহা

www.draminlibrary.com

কতই না ভাল হতো যদি দুনিয়ার জীবনে সঠিক ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতাম এবং সুস্থ বিবেকের বুঝ মানতাম।

আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, বনি আদম হিসেবে অর্থাৎ একই আদি পিতার সন্তান হিসেবে আপনাদের যেহেতু আমি ভাই বলে মনে করি তাই আপনাদের প্রতি আমার ভাই হিসাবে দায়িত্ব রয়েছে আপনাকে আগুনের পথ থেকে ফেরানো ও সত্যের দিকে ডাকা। আমি সেই দায়িত্ব পালন করলাম। আমার ডাকে আপনি সাড়া দেবেন কিনা সে দায়িত্ব আপনার।

শিক্ষিত হিন্দু ভাইদের প্রতি একটি নিবেদন

বনি আদম হিসেবে আমি আপনার ভাই। আর ভাই হিসেবেই একটা কথা গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতে অনুরোধ করবো। চিন্তা করুন, ধর্মের সম্পর্ক হলো বিশ্বাসের সঙ্গে। আর (আমি পূর্বেও বলেছি) বিশ্বাসের সম্পর্ক রক্তের সঙ্গে নয়; এর সম্পর্ক হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে।

১। চিন্তা করুন, আপনার ধর্মগ্রন্থ বলে ঃ

বৃহস্পতির স্ত্রী তারার আপত্তি সত্ত্বেও তার সাথে ব্যাভিচার করার কারণে চন্দ্রকে তারা অভিশাপ দেয়। আর এই অভিশাপের কারণে চাঁদ মাঝে মাঝে রাহুগ্রস্ত হয়। যার ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?

২। চিন্তা করুন, যে মন্ত্রে পাপ খণ্ডন হয় সে-মন্ত্র হচ্ছে ঃ

অহল্যা দ্রৌপদি কুন্তি তারা মন্দোদরী যথা–

পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম।

অর্থাৎ অহল্যা, দ্রৌপদি, কুন্তি, তারা এবং মন্দোদরী এই পাঁচ কন্যার নাম প্রত্যহ স্মরণ করলে মহাপাপও মাফ হয়ে যায়। যাদের প্রত্যেকের যৌন জীবন সম্পর্কে আপনাদের জানা আছে। তাদের স্মরণে যে ধর্মের পাপ মাফ হয়ে যায় সে ধর্ম কি আজকের সভ্য যুগে চলতে পারে?

৩। এই ধরনের আরও বহু প্রশ্নকে সামনে রেখে আপনি চিন্তা করুণ হিন্দুধর্ম কি আসলে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির কোন পথ দেখাতে পারে?

দেখুন, আপনি যখন বলেছেন যে 'আমি একজন হিন্দু', তখন ঐসব চরিত্রহীনাদের সঙ্গে হয়ে পড়ছে আপনার ধর্মীয় সম্পর্ক; আর যখনই বিশ্বাস শুদ্ধ করে নিয়ে আপনি বলছেন যে "আমি একজন মুসলমান' তখনই আপনার সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে কুরআন হাদীস ও নবী রাসূলগণের সঙ্গে।

www.draminlibrary.com

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন আল্লাহর বাণী
এবং
মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল

১নং যুক্তি ঃ

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন লেখকের জন্ম হয়নি যার প্রথমবারের লেখার আর কোন ভুলত্রুটি সংশোধন করা লাগে না। অথচ কুরআনের কথাগুলি রাসূল (সঃ) যা শুনেছেন তাই বলেছেন ঠিক তাই লেখা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কোন বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও কোন একটা ব্যাকরণের ভুলও ধরতে পারেননি। এটা কি আল্লাহর কথা ছাড়া সম্ভব? কোন পাগলও বলবে না যে তা সম্ভব।

২ নং যুক্তি ঃ

প্রত্যেকের বাচনভঙ্গির মধ্যে কিছুটা এমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যা একজনের বাচন ভঙ্গি অপরজনের বাচনভঙ্গির সাথে মিল খায় না। আমরা দেখি কুরআন ও হাদীস একই ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া কিন্তু দুইটার বাচন ভঙ্গি দুই প্রকার। কারণ একটা আল্লাহর কথা আর অপরটা রাসূলের কথা।

৩নং যুক্তি ঃ

পৃথিবীতে এমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্ম হয়নি যিনি সুস্থ শরীরে বলতে পেরেছেন যে আগামী বছর এই সময়ের পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। কিন্তু রাসূল তা বলতে পেরেছিলেন। তিনি নবম হিজরীর হজ্জ শেষ হওয়ার পর সূরা 'নসর' নাযিল হলে প্রায় সোয়া লাখ তৌহিদী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন যেটার নাম হল 'বিদায় হজ্জের ভাষণ'। তিনি অহির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে খবর পেয়ে বললেন যে সামনের হজ্জে আমাকে আর পাবে না। কাজেই আমার জীবনের শেষ ভাষণ তোমরা শুনে রাখ।

www.draminlibrary.com

পৃথিবীতে বহু জ্ঞানী গুণি লোকের জন্ম হয়েছে। বহু হেকিম কবিরাজ ও ডাক্তারের জন্ম হয়েছে কেউ কি তাঁর মৃত্যুর ৩ মাস পূর্বে সুস্থ শরীরে বলতে পেরেছিলেন যে আমি আর ৩ মাস পর্যন্ত বেঁচে আছি এরপর আর থাকব না? কিংবা কোন বক্তা কি কোন ঈদের নামাযের সময় বক্তৃতার মাঝে বলতে পেরেছেন যে আমি সামনের বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকব না। তা কেউ পারেনি। কিন্তু রাসূল (সঃ) হজ্জের মাঠ থেকেই বলেছিলেন যে সামনের হজ্জে আর আমাকে পাবে না। আল্লাহ না বললে এরূপ বলা কি করে সম্ভব ছিল?

৪ নং যুক্তি ঃ

এক সময় পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন পৃথিবী স্থির। এক সময় বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হল সূর্য স্থির পৃথিবী ঘুরেই দিনরাত হয়। কিন্তু আল্লাহ চৌদ্দ শত বছর পূর্বেই বলেছেন, "কুল্লুন ফি ফালাকেঁই ইয়াসবাহুন" (সূরা ইয়াসিন ঃ ৪০) মহাশূন্যের প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্রসহ সব কিছুই ঘুরছে। একই কথা বলা হয়েছে সূরা লোকমানের ২৯ নং আয়াতে, সূরা রা'দ এর ২নং আয়াতে, সূরা ফাতির-এর ১৩ নং আয়াতে এবং সূরা জুমার ৫নং আয়াতে। কুরআন আল্লাহর বাণী না হলে ১৪০০ বছর পূর্বের কোন বড় পণ্ডিতের জন্যে এটা বলা সম্ভব ছিল? আর আজকের দিনে বিজ্ঞান সেই ১৪০০ বছর পূর্বের কথাই স্বীকার করে নিল যে মহাশূন্যের সবকিছুই ঘোরে ও চলে।

৫নং যুক্তি ঃ

সূরা মুরসালাতের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, আমি পৃথিবীকে মহাশূন্যে এক শক্তিবলে সামলে রাখার ব্যবস্থা কি করিনি? আর সূরা আল-মূলকে আল্লাহ বলেছেন তিনি পৃথিবী ভূ-তলকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমরা এর সব জায়গা দিয়ে চলা ফেরা করতে পার। এর দ্বারা মধ্যাকর্ষণ শক্তি বুঝায় যার কারণে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই ভূ-তল পায়ের নীচে থাকে, যার জন্যে সর্বত্রই চলা ফেরা করতে পারি। কুরআন নাযিলের পূর্বে এ কথা কেউ কি বলতে পেরেছিল?

www.draminlibrary.com

৬নং যুক্তি ঃ

আল-কুরআনের সূরা আর্ রাহমানের ২২নং আয়াতে বলা হয়েছে সমুদ্রের ভিতর থেকে মণিমুক্তা ও প্রবাল বের হয়। ১৪০০ বছর পূর্বে এ কথা কে বলতে পেরেছিল?

৭নং যুক্তি ঃ

সূরা বাকারার ১৯নং আয়াতে বলা হয়েছে বৃষ্টির সাথে থাকে ঝড়-তুফান, বিজলীর চমক ও মেঘের ডাক। মানুষ এগুলি ছাড়াই বৃষ্টি চায় কিন্তু এগুলি ছাড়া বৃষ্টি হয়না। সূরা রা'দের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন বিজলীর মধ্যে ভয়েরও কারণ আছে এবং ভরসারও কারণ আছে। এই ভরসাটা কি? এটাই হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে রক্ষিত নাইট্রোজেন গ্যাস যা বিদ্যুৎ চমকের মাধ্যমে নাইট্রেটে পরিণত হয়এবং বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে আসে। এ ভাবেই আল্লাহ. অনুর্বর যমীনকে উর্বর করে গড়ে তোলেন। আল্লাহর ভাষা হচ্চে 'ফা আহইয়া বিহিল আরদা বা'দা মাওতেহা।' এ ভাবেই আমি অনুর্বর যমীনকে উর্বর করে গড়ে তুলি। এই ধরনের আয়াত কুরআন শরীফের ৫ জায়গায় রয়েছে যথা ঃ–

সূরা	আল-বাকারা	১৬৪	আয়াত
সূরা	আর-রূম	৬৪, ৬৫	"
সূরা	আল-আনকাবুত	৬৩	"
সূরা	আন-নমল	৬৫	"

এ কথা ১৪০০ বছর আগে কে বলতে পেরেছিল যে গাছের খোরাক নিয়ে বৃষ্টিপাত হয়?

৮নং যুক্তি ঃ

কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কে বলতে পেরেছিল যে আসমান ও যমীন পূর্বে একত্রে মিলিত ছিল। এরও পূর্বে ধোঁয়ার একটা পিন্ডলি ছিল। আর যে মানুষটি কোন দিন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে এক দিনও দু'টো হরফ

www.draminlibrary.com

পড়াশুনা করেননি তিনি কি করে নিজের থেকে এসব কথা বলতে পারেন? যা আজ বিজ্ঞান স্বীকার করছে?

৯ নং যুক্তি ঃ

সম্প্রতি মিশরের এক তরুন বিজ্ঞানীর পরীক্ষায় ধরা পড়ল আল্লাহ যে عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ বলেছেন অর্থাৎ এর উপর আমি উনিশ সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। সেই উনিশের উপর গবেষণা করে তিনি দেখলেন আল কুরআন লিখতে আরবীতে অক্ষর লাগে ছয়টি আর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে অক্ষর লাগে ১৯টি। এই ৬×১৯=১১৪ এই ১১৪টি হচ্ছে আল কুরআনের সূরার সংখ্যা। আর পরীক্ষায় ধরা পড়ল আল কুরআনের অক্ষরের সংখ্যার সঙ্গে ১৯ এর সম্পর্ক। দেখা গেল যে সব সূরার প্রথমে 'হরফে মুকাত্তায়াত' বা কাটা কাটা অক্ষর আছে, যেমন – طٰهٰ – قٓ – نٓ – يٰسٓ – الٓمٓ ইত্যাদি মুকাত্তায়াত হরফগুলি সূরার মধ্যে যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন উদাহরণ স্বরূপ যে সূরা ن দ্বারা শুরু হয়েছে তার মধ্যে নূন যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যে সূরা ق দ্বারা শুরু হয়েছে সে সূরায় যতবার ق আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এমন সৃষ্টি কি পৃথিবীর কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব? সাম্প্রতিক কালের কম্পিউটার নাকি বলেছে যে কেউ যদি সতর্কতা ও সচেতনতার সঙ্গে লিখতে থাকেন তাহলে ৬২৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ বার লিখলে হয়ত ঘটনাচক্রে একবার একখানা কুরআন শরীফ লেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এতবার লেখা কি একটি জীবনের পরিসরে সম্ভব? বরং কতগুলি জীবন একত্র করে যদি কেউ একা কয়েক হাজার বছরের হায়াত নিয়ে আসতে পারে তাহলে হয়ত সম্ভব হতো কিন্তু এটা কি মানব জীবনের জন্যে সম্ভব? অথচ রাসূল (সঃ) একবারই মাত্র মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন। আর তাতেই মিলে গেল এভাবে ১৯ এর হিসাব। এইটাই তো আল-কুরআনের মো'জেযা।

www.draminlibrary.com

১০ নং যুক্তি ঃ

আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন কেউই আল-কুরআনের একটি কথাকেও অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করতে পারেননি। বাস, এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট যে আল-কুরআন সত্যই আল্লাহর বাণী এবং যার মাধ্যমে আল-কুরআন পাওয়া গিয়েছে তিনি সত্যই আল্লাহর নবী।

আশা করা যায় পৃথিবীর মানুষ যতই এর উপর চিন্তা ভাবনা করবে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝার চেষ্টা করবে ততই মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং এই বিজ্ঞান ও দর্শনের চরম উন্নতির যুগে কেউ আর অন্ধকারে থাকবে না।

আল্লাহ্ তৌফিক দিন আমাদের সকলকে যেন আমরা সবাই সত্যকে সত্য বলে মানতে পারি এবং সত্যকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করে পরকালের নাজাতের পথ ধরতে পারি।

এবার আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে মানুষের স্বার্থেই পরকাল হতে হবে।

www.draminlibrary.com

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষের দাবীতেই পরকাল

পরকাল যে সত্যিই হবে তার যুক্তি

১নং যুক্তি ঃ

মানুষ সাধারণতঃ দু'টো কারণে মিথ্যা বলে। যথাঃ–

১। কোন না কোন লোভ বা স্বার্থের বশীভূত হয়ে– অথবা

২। কোন না কোন ভয়ের কারণে।

এ দু'টো জিনিস যখন কারও সামনে থাকে না তখন সে সত্য কথাই বলে এটাই মানব প্রবৃত্তি। আমরা দেখি দুনিয়ার নবী রাসূল (সঃ) সবাই বলেছেন পরকাল হবে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই এমন ছিলেন যে, কোন প্রকার লোভ বা ভয় তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। কাজেই তাঁরা যখন সবাই একই কথা বলেছেন তখন অবশ্যই তা মিথ্যা হতে পারে না।

২ নং যুক্তি ঃ

যা সত্য সাক্ষ্য তা যত মানুষই (সাক্ষ্য) দিক না কেন প্রত্যেকের কথা একই প্রকার হয়। আর যা মিথ্যা সাক্ষ্য তা কখনও একটার সাথে অন্যটার মিল হয় না। যেমন একই অংকের সঠিক উত্তর প্রত্যেকটি একই প্রকার হয়, কিন্তু ভুল উত্তর কখনও একটার সাথে অন্যটার মিল হয় না। এই যুক্তি মুতাবিক দেখা যায় আল্লাহর প্রত্যেক নবী আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত এবং পরকাল সম্পর্কে হুবহু একই কথা বলেছেন। যদিও তারা বহু যুগ বা শতাব্দীর ব্যবধানে পৃথিবীতে এসেছেন। কারও সাথে কারও দেখা হয়নি অথচ তারা একই কথা বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে একথা মিথ্যা হলে সবার কথা একই প্রকার হতে পারতো না।

৩ নং যুক্তি ঃ

আল্লাহতে বিশ্বাসীগণ আমরা আল্লাহকে এভাবে পেয়েছি যে, যা-ই আমাদের প্রয়োজন তা-ই তিনি দেন। আর যা-ই আমাদের মনের মৌলিক দাবী তা-ই তিনি পূরণ করেন। এর ব্যতিক্রম আমরা পাইনি। আর লক্ষ্য করা

www.draminlibrary.com

গেছে যে আল্লাহ সবই দেন বটে কিন্তু প্রয়োজনের পূর্বে দেন না। যেমন শিশুকালে যখন দুধের প্রয়োজন ছিল তখন মায়ের স্তনে দুধ দিয়েছেন কিন্তু যতদিন দুধ খেয়েই বাঁচতে হয় ততদিন আল্লাহ দাঁত দেন না। যদি ঐসময় কেউ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করত যে, আল্লাহ তুমি সবাইকে দাঁত দিয়েছ আমাকে কেন দিলে না? তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার জবাব ছিল এইরূপ যে তোমাকে দাঁত অবশ্যই দেয়া হবে যখন তোমার চিবিয়ে খাবার প্রয়োজন হবে। এখন দুধ চুষে খাবার সময় যদি তোমাকে দাঁত দেই তাহলে তোমার মায়ের স্তনে কামড় লেগে যেতে পারে। এতে তোমার মায়ের কষ্ট হবে তাই এখন তোমাকে দাঁত দেইনি। কিন্তু প্রয়োজন মত অন্যেরা যেমন দাঁত পেয়েছে তেমন তুমিও দাঁত পাবে। দাঁত আমরা এভাবেই পেয়েছি। আর এইটাই হলো আল্লাহর সবকিছু দেয়ার বিধান। অর্থাৎ মানুষের জন্যে যখন যা দরকার আল্লাহ তখনই তা দিয়ে থাকেন। শুধু মানুষের জন্যে নয়, আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টি বস্তুরই টিকে থাকার জন্যে যখন যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছু দেয়াই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধান। এবার আসুন একটু যাচাই করে দেখি যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির চাহিদা কিভাবে পূরণ করেন।

সৃষ্টির চাহিদা পূরণই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান

দেখুন মানুষকে আল্লাহ হিকমত দিয়েছেন যা কাজে লাগিয়ে মানুষ শীতবস্ত্র তৈরি করে এবং তা দিয়ে শীত নিবারণ করে। কিন্তু জীব-জানোয়ারকে আল্লাহ যেহেতু কাপড় লেপ কাঁথা তৈরির হেকমত দেননি তাই তাদের গায়ে দিয়েছেন ঘন পশম। আর পশমকে আল্লাহ করেছেন তাপ অপরিবাহী। যার ফলে প্রতিটি প্রাণীর গায়ের গরমে পশম গরম হয়, আর পশম তাপ পরিবহন ক্ষমতা রাখে না বলে পশমের তাপ ছুটে যেতে পারে না। তা গরম অবস্থাতেই থাকে। সেই গরমে তাদের শীত বস্ত্রের কাজ হয়ে যায়। এভাবে পাখীর পালক তার পোশাকের কাজ করে। আবার দেখি নাতিশীতোষ্ণ দেশের পশুর চাইতে শীত প্রধান দেশের পশুর গায়ের পশম ঘন এবং লম্বা। এর কারণ ঐ একটাই যে আল্লাহ তার শীতবস্ত্রের চাহিদা পূরণ করেছেন। এভাবে উই পোকাকে আল্লাহ চোখ দেননি তাই তার খাদ্য করেছেন তা-ই যা তার সামনে পড়বে। সে শক্ত কাঠ খেয়ে হজম করে ফেলবে যা মানুষ পারবে না।

www.draminlibrary.com

আবার দেখুন শীতের মৌসুমে ঠাণ্ডা পানির মধ্যে মাছ বাস করে তাদের ঠাণ্ডা লাগে না, কাশি হয়না, নিউমোনিয়াও হয় না। কিন্তু আমরা ঐ পানিতে নামতেই পারি না। এইটাই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বিধান। এ কারণেই আল্লাহ্ বলেছেন–

لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا "তোমরা কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।" উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল আল্লাহর বিধানই হচ্ছে এই যে, তিনি যাই সৃষ্টি করেছেন তারই টিকে থাকার জন্য যা চাহিদা তা তিনি যথা সময়ে পূরণ করে থাকেন।

আমরা এ বিষয়ের উপর চিন্তা ভাবনা করলে খুঁজে পাব একটা সূত্র সে সূত্র হচ্ছে এই যে, যাই তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্টির দাবী তাই তিনি পূরণ করেন। এই সূত্রের যথার্থতা আমরা দেখি প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর এই সূত্র মুতাবিক মানব মনের একটা বড় মৌলিক দাবি হচ্ছে ভাল কাজের জন্য ভাল ফল এবং মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল পাওয়া। তা অবশ্যই আল্লাহ্ পূরণ করবেন। কিন্তু দেখছি এ দাবি পূরণ হচ্ছে না। আর দেখছি মানব মনের আরও একটা দাবি পূরণ হচ্ছে না সেটা হলো পাপ পূণ্যের পরিমাপযন্ত্র অর্থাৎ এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার হলে ভাল হত যে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ বলে দিতে পারত যে কে কতটুকু পাপী আর কে কতটুকু পূণ্যবান অর্থাৎ কার কি পরিমাণ শাস্তি হওয়া উচিত আর কার কি পরিমাণ পুরস্কার পাওয়া উচিত। কিন্তু এ ধরনের কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কার হচ্ছে না। কেন তা হচ্ছে না? এর কারণ হলো আল্লাহর বিধানই হচ্ছে সবকিছু পাওয়ার জন্যে একটা উপযুক্ত সময় আসতে হবে। যেমন দাঁতের বয়স না হলে দাঁত পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি পাপ পূণ্যের পরিমাপযন্ত্র তখনই পাওয়ার কথা যখন পাপ আর পূণ্য নতুন করে হতে পারবে না। আর যত দিন পর্যন্ত পাপ আর পূণ্য হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সঠিক মাপ আসতে পারবে না। তাই যে দিন পাপ পূণ্য খাতায় জমা হবে না বা আমলনামায় লেখা বন্ধ হয়ে যাবে সেদিনই পরিমাপ যন্ত্র 'মিযান' আল্লাহ্ নিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, যে-লোকটা মরে গেছে তার তো পাপ পূণ্য বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তা হয়নি। আল্লাহ্ বলেন–

نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط

নাহনু নুহয়িল মাওতা ওয়া নাকতুবু মা কাদ্দামু ওয়া আছারাহুম

www.draminlibrary.com

অর্থাৎ আমি লিখছি ও লিখতে থাকব যা তারা পূর্বে বেঁচে থাকা অবস্থায় করেছে আর যা তাদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া। সূরা ইয়াসীন ঃ ১২। অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি কোন ভাল কাজ করে তবে মরে গেলেও তার ছওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয় যেটাকে বলা হয় ছদকায়ে জারিয়া। আর বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি গোনাহের কাজ জারী করে যায়– যেমন ধরুণ একটা সিনেমার হল কেউ তৈরি করে গেল– তার মৃত্যুর পর ঐ সিনেমা হলে যত গোনাহর কাজ হতে থাকবে তার সমতুল্য গোনাহ ঐ হলের প্রতিষ্ঠাতার নামে জমা হতে থাকবে। আর এটা বন্ধ হবে তখনই যখন পৃথিবী ফানা হয়ে যাবে। কোন মসজিদও থাকবে না কোন সিনেমা হলও থাকবে না। সেইদিন ছওয়াব লেখাও বন্ধ হবে এবং গোনাহ লেখাও বন্ধ হবে। এরপর ঐ দু'টো চাহিদা পূরণের জন্যে ভিন্ন পদ্ধতির এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে। যেখানকার জীবন হবে চিরস্থায়ী জীবন। যে জীবনে শাস্তি ও পুরস্কার ভোগ করার মত উপযুক্ত সময় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর বোমা ফেলে যে লোকটি এক মুহূর্তের মধ্যে কত হাজার হাজার মানব সন্তানকে মেরে ফেললো তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হলে তাকে হাজার হাজার বার মারা দরকার। কিন্তু এই পৃথিবীর জীবনে যেখানে একটা মানুষকে মাত্র একবারই মেরে ফেলা যায় সেখানে একাধিক ব্যক্তির হত্যাকারীকে উচিৎ শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। তাই মানব মনের দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটা চিরস্থায়ী জীবন দিতে হবে যেখানে একাধিক ব্যক্তির হত্যাকারীকে একাধিক বার হত্যা করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যারা এ পৃথিবীর উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের ভালো করতে গিয়ে চরম জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া যায় এবং সে পুরস্কার ভোগ করার মত একটা দীর্ঘ সময়ও তাকে যায় হোক। মানুষের মনের এই মৌলিক দাবি পূরণ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবেন। আর তা যদি আল্লাহ না-ই দেন তবে ন্যায় বিচারক হিসাবে গণ্য হতে পারেন না।

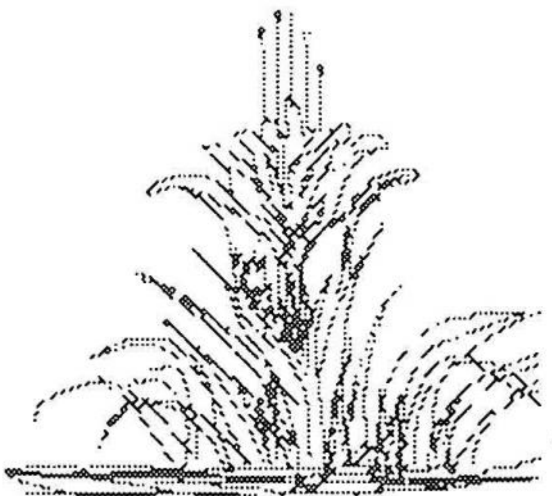
এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো পরকাল হতে হবে মানুষের প্রয়োজনেই। কাজেই তা আল্লাহ্ দিতে ওয়াদা করেছেন যেন তিনি ন্যায় বিচার করতে পারেন এবং তা কার্যকর করতে পারেন।

www.draminlibrary.com

উপসংহার

মানুষের মগজের অবস্থা এমন যে তাকে একটা রেডিও সেটের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যেমন রেডিওর মিটার যে সেন্টারের সঙ্গে জুড়ে দিবেন সেই সেন্টার থেকে সংবাদ আসতে থাকবে। ঠিক তেমনই আপনি যে বিষয়ের উপর চিন্তা ভাবনা করবেন সে বিষয়ের জ্ঞান আপনার মগজে আসতে থাকবে। আপনি যখন পদ্মানদী থেকে ইলিশ মাছ ধরার পন্থা সম্পর্কে চিন্তা করবেন তখন কি আর্কিমিডিসের সোনা মাপার থিওরী আপনার মগজে ধরা পড়বে? তা যেমন পড়ে না তেমন আপনি যখন চিন্তা করবেন লেনিনবাদ মার্কসবাদ বা মাওবাদের উপর তখন কি আর আপনার মগজে আল্লাহর অস্তিত্ব ধরা পড়বে? আপনার মগজের মিটারটাকে আরশে মুয়াল্লার সঙ্গে জুড়ে দিন দেখবেন সেখান থেকে আপনার মগজে বহু খবর আসতে থাকবে এবং আমি আশা করি আমার চাইতে আপনার মগজে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন আরও বেশি ধরা পড়বে। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

সমাপ্ত



www.draminlibrary.com